জানুয়ারী
১৯৮৯

পৌষ
১৩৯৫

সন্দেশ

ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

সম্পাদক

লীলা মজুমদার, সত্যজিৎ রায়
নলিনী দাশ

গল্প · কবিতা · উপন্যাস · খেলাধুলা · বিজ্ঞান · চিঠিপত্র · ধাঁধা · প্রতিযোগিতা ইত্যাদি

১৩৯৫ সালের সন্দেশের দাম ও চাঁদার হার

১৩৯৫ সালে সন্দেশের প্রতি সংখ্যার দাম ৪·০০ শারদীয়া সংখ্যা ২২·০০।

বার্ষিক (বৈশাখ-চৈত্র) সডাক ৫০·০০, শারদীয়া সংখ্যা রেজিস্টার্ড ডাকে যাবে।

শারদীয়া সংখ্যা হাতে নিলে বৈশাখ-চৈত্র ৪৫·০০, সব কটি সংখ্যা হাতে নিলে ৪০·০০।

এখনও গ্রাহক হওয়া যাচ্ছে।

প্রতি বাংলা মাসের মাঝামাঝি, ইংরাজী মাসের প্রথমে সন্দেশ প্রকাশিত হয় এবং Under Certificate of Posting পাঠান হয়।

ইংরেজি মাসের তৃতীয় সপ্তাহেও বই না পেলে লিখিত নালিশ জানালে ডুপ্লিকেট দেওয়া হয়।

সন্দেশের চাঁদা মানিঅর্ডারে, নগদে অথবা 'চেকে' পাঠান যায়। Sandesh নামে চেক লিখবেন, মফঃস্বলের চেক দিলে ভাঙ্গাবার খরচ আট টাকা লাগবে। পোস্টাল অর্ডার নেওয়া হয় না।

গ্রাহক-গ্রাহিকারা চিঠিপত্র, ধাঁধার উত্তর, লেখা, ছবি ইত্যাদি পাঠাবার সময়ে গ্রাহক নম্বর, নাম ঠিকানা ও বয়স স্পষ্ট করে লিখবে। সন্দেশ পাঠাবার সময়ে নামের বাঁ পাশে গ্রাহক সংখ্যা লিখে দেওয়া হয়। গ্রাহক স্কুল, ক্লাব বা লাইব্রেরির প্রতিটি ছাত্র/মেম্বার গ্রাহক। ব্যক্তিগত উত্তর চাইলে জোড়া পোস্ট কার্ড লিখতে হবে।

লেখকেরা স্বনামাঙ্কিত পোস্টকার্ড দিলে ফলাফল জানানো হবে। উপযুক্ত টিকিটযুক্ত খাম না দিলে অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হবেনা। কোন মাসে লেখা পাঠানো হয়েছিল সঠিকভাবে না জানালে ফলাফল জানানো সম্ভব নয়। আলগা টিকিট পাঠাবেন না।

হাতে নিলে পাঁচ, ডাকে নিলে পনের কপির কমে এজেন্সি দেওয়া হয় না। আমরা নিজব্যয়ে মফঃস্বল এজেন্টকে পত্রিকা পাঠাব কিন্তু ফেরত দেবার ডাক খরচ এজেন্টকে দিতে হবে। রেলে ফেরত নেওয়া হয় না। ৫-৯৯ কপিতে ২৫%, ১০০—৩৩·৩৩% কমিশন।

বিজ্ঞাপনদাতারা অনুগ্রহ করে ছয় সপ্তাহ আগে ব্লক, আর্টপুল, পাণ্ডুলিপি পাঠাবেন।

বিজ্ঞাপন প্রতিনিধি—আনন্দ ঘোষ

সন্দেশ কার্যালয়—১৭২/৩, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ ফোন : ৪৬-৪৯১৯

নিউস্ক্রিপ্টের দোকান—এ-১৪, কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা ৭০০০০৭

পাতিরাম বুক স্টল কলেজ স্ট্রীট জংশন	রবীন বর্মন টাইমস অব ইণ্ডিয়া ও হাওড়া এলাকায়	প্রশান্ত নন্দী গড়িয়াহাট বিপনি গড়িয়াহাট মোড়	অবনী দেয়াসী হাজরা মোড়
শ্যামল ভট্টাচার্য ৭৭ মহাত্মা গান্ধী রোড কলি-৯ (টেমার লেনের মুখে)	পাত্র বুক ষ্টল	রসরাজ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট	সুশীল দত্ত শ্যামবাজার

হাওড়া, শিয়ালদহ ও অন্যান্য বড় বড় রেলওয়ে ষ্টেশনে হুইলার বুক ষ্টল

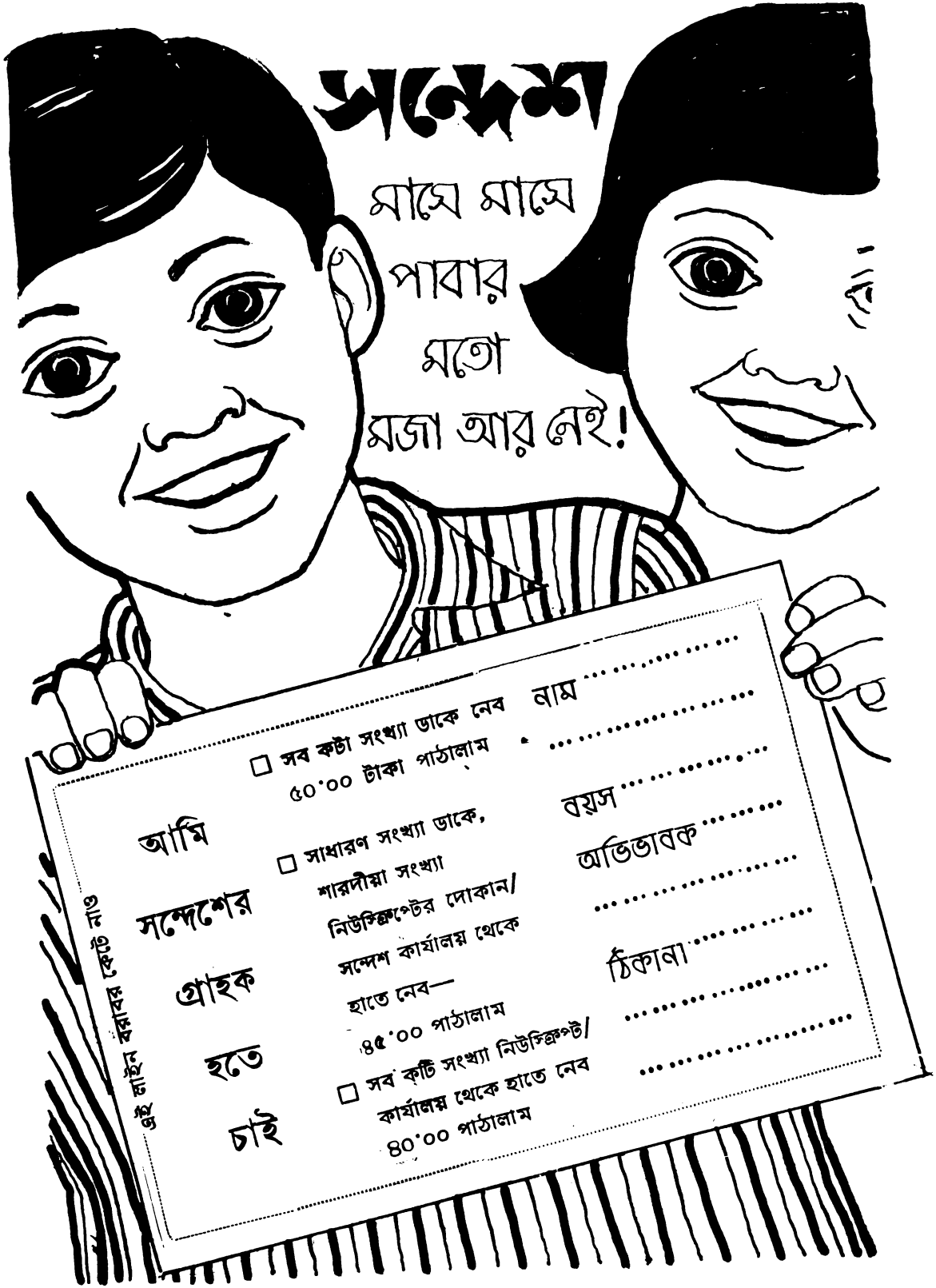
সন্দেশ
মাসে মাসে
পাবার
মতো
মজা আর নেই!
আমি
সন্দেশের
গ্রাহক
হতে
চাই
☐ সব কটা সংখ্যা ডাকে নেব
৫০·০০ টাকা পাঠালাম
☐ সাধারণ সংখ্যা ডাকে,
শারদীয়া সংখ্যা
নিউস্ক্রিপ্টের দোকান/
সন্দেশ কার্যালয় থেকে
হাতে নেব—
৪৫·০০ পাঠালাম
☐ সব কটি সংখ্যা নিউস্ক্রিপ্ট/
কার্যালয় থেকে হাতে নেব
৪০·০০ পাঠালাম
নাম
বয়স
অভিভাবক
ঠিকানা
জ্ঞ লাইন বরাবর কেটে নাও

PHILIPS

ফিলিপ্‌স

এই ৬০ ওয়াটের ল্যাম্প থেকে আপনি ১০০ ওয়াটের বাল্‌বের মতনই আলো পাচ্ছেন

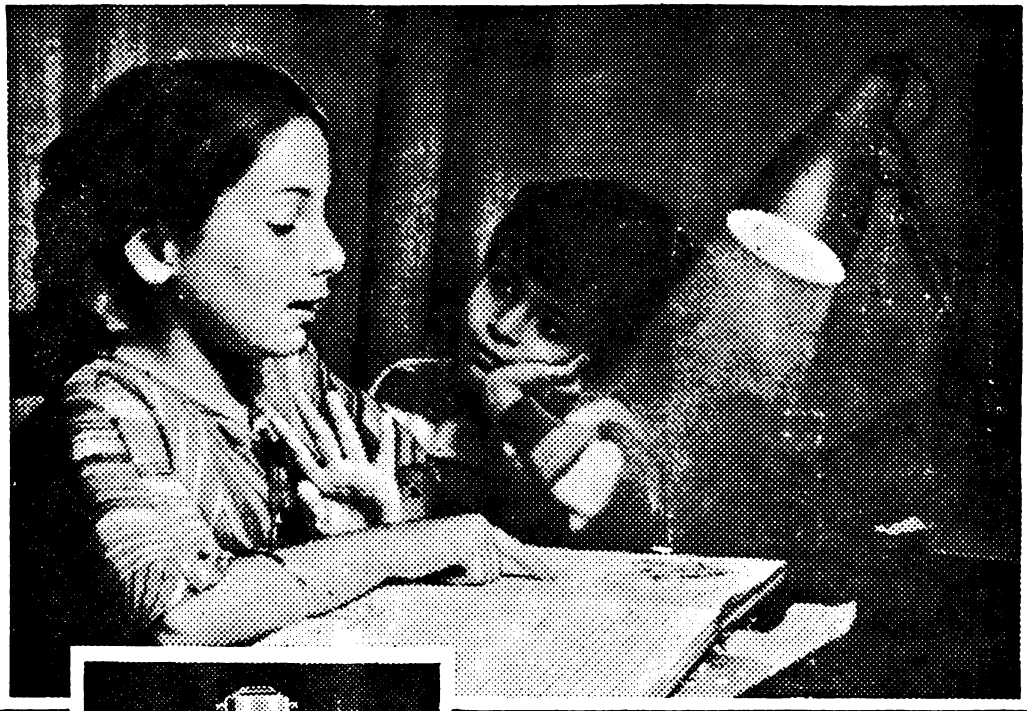

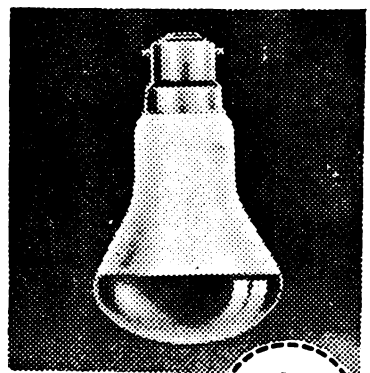

বিজলী খরচ বাঁচায় ২৪ টাকা

ফিলিপ্‌স আর্জেণ্টা সুপারলাক্স

এই আর্জেণ্টা সুপারলাক্সের আলো দেয়ার অংশটি বিশেষ ধরনের ফ্রস্টেড অর্থাৎ-ঘষা কাঁচের হওয়ার দরুন আপনি দরকার মত জায়গায় সরাসরি চমৎকার আলো পাবেন। আর্জেণ্টা সুপারলাক্স ৬০ ওয়াট ল্যাম্পের তেজী রশ্মি যেকোনো সাধারণ ১০০ ওয়াট বাল্‌বের মতনই আলো দেয়। আর্জেণ্টা সুপারলাক্স আপনার বিজলী খরচ বছর পিছু ২৪ টাকার মতন বাঁচিয়ে দেবে আর চলবেও বেশীকাল।

লেখাপড়া, আঁকা, স্কেচ করা, বোনা···সব একাগ্র সূক্ষ্ম কাজের জন্যই এ হ'ল এক আদর্শ ল্যাম্প।

৪০ ওয়াট ও ৬০ ওয়াটের ল্যাম্প পাবেন।

ফিলিপ্‌স আর্জেণ্টা সুপারলাক্স—১০০ ওয়াট বাল্‌বের তুলনীয় আলো দেয়ার ৬০ ওয়াট ল্যাম্প

HTB-PEI 9727

ফিলিপ্‌স—পঞ্চাশ বৎসরাধিক কাল ভারতের ঘরে-ঘরে বিশ্বস্ত নাম

পৌষ ১৩৯৫

সন্দেশ

ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র

জানুয়ারী ১৯৮৯

লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায় সম্পাদিত

গল্প সংখ্যা

গল্প

রাবণ / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮২৪
বানর রাজপুত্র / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৩১
শেয়াল রাজা / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৩৭
দুর্বাসা মুনি / লীলা মজুমদার ৮৫৪
আগুন্ রাঙা দিনগুলি / করুণাময় বসু ৮৫৭
গণেশের কাণ্ড / সুরজিত দাশগুপ্ত ৮৬৪
কণিয়া / সলিল চট্টোপাধ্যায় ৮৭৫
কারু ও লক্ষ্মী / শৈবাল চক্রবর্তী ৮৮১
নীলগিরির ওপারে / অচিন্ত্য দাস ৮৮৭

ধারাবাহিক উপন্যাস

থারটিন আপ ঝমঝমা এক্সপ্রেস / শিশিরকুমার মজুমদার ৮৪১

কমিক স্ট্রিপ

টোটোর অ্যাডভেঞ্চার / গল্প নলিনী দাশ, ছবি —প্রশান্ত ৮৬২
ন্যাড়া / হিজি বিজ বিজ ৮৫৩ ৮৭৯

কবিতা ও ছড়া

টুপুর কথা / আশিস মুখার্জী ৮১৩
বুড়ী রাক্ষসী / বিজয়চন্দ্র মজুমদার ৮৩০
পাখীর গান / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৩৬
কম্‌লা নাপিত / উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৮৩৯
নামজাদা / সুখেন্দু মজুমদার ৮৫২
ময়না তদন্ত / ভবানী প্রসাদ মজুমদার ৮৭৩
রূপকথার দেশে / প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায় ৮৮০
রহস্যময় সিন্দুক / সুবীর গুপ্ত ৮৮০
বাপরে বাপ / নিখিল তরফদার ৮৯০

কালাচাঁদ বনাম পাগলা দাশু ৮৭৪

সন্দেশ
ছেলেমেয়েদের সচিত্র মাসিকপত্র
পৌষ ১৩৯৫
জানুয়ারী ১৯৮৯

টুপুর কথা

আশিস মুখার্জি

শীত পড়েছে তাইতো আবার
দিচ্ছি মনে পড়িয়ে
টুপুর কথা, কারণ জানি
তোমরা গায়ে জড়িয়ে—
ঘুরছো এখন রঙিন চাদর
গরম জামা, টুপি ও।
কিন্তু টুপুন ? এ হিম শীতে
কষ্ট যে পায় খুব-ই ও।
কারণ টুপুর জামা-ই তো নেই,
তাইতো আদুল গাটি ওর—
ঢাকতে যেন একটি জামা
তোমরা ওকে পাঠিয়ো।
কোথায় পাবে টুপুর দেখা
রাখছি সেটাও জানিয়ে,
টুপুন থাকে গাছ তলে আর
ফুটপাতে ঘর বানিয়ে।

রাবণ

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী

রাবণের কথা তোমরা সকলেই জান। রাবণের পিতার নাম বিশ্রবা, মায়ের নাম কৈকসী। বিশ্রবা পরম ধার্মিক মুনি ছিলেন। রাবণ আর তাহার ভাইবোনেরা জন্মিবার পূর্বেই তিনি বলিয়াছিলেন যে, ইহাদের সকলের ছোটটি খুব ধার্মিক হইবে, আর সকলেই ভয়ঙ্কর দুষ্ট রাক্ষস হইবে।

মুনি যাহা বলিয়াছিলেন তাহাই হইল। রাবণ, কুম্ভকর্ণ আর তাহাদের বোন সূর্পনখা, ইহাদের এক একটা এমনি বিকট আর দুষ্ট রাক্ষস হইল যে কি বলিব! ইহাদের ছোট ভাই বিভীষণও রাক্ষস ছিল বটে, কিন্তু সে যারপর নাই ভাল লোক ছিল।

রাবণের দশটা মাথা আর কুড়িটা হাত ছিল। দাঁতগুলো ছিল থামের মত বড়বড়, চুলগুলি আগুনের শিখার মত লাল, আর শরীরটা কালো পর্ব্বতের মত বিশাল। তাহার জন্মের সময় পৃথিবী কাঁপিয়াছিল, সূর্য ময়লা হইয়া গিয়াছিল, আর সমুদ্রের জল তোলপাড় হইয়া উঠিয়াছিল। দশটা মাথা দেখিয়া তাহার পিতা তাহার নাম রাখিয়াছিলেন দশগ্রীব। উহাই তাহার আসল নাম, রাবণ নাম পরে হইয়াছিল।

ছেলেবেলায় রাবণ ভাইদিগকে লইয়া দশ হাজার বৎসর ভয়ঙ্কর তপস্যা করিয়াছিল। এই দশহাজার বৎসর সে আহার করে নাই। এক এক হাজার বৎসর যাইত আর নিজের এক একটি মাথা কাটিয়া সে আগুনে আহুতি দিত। নয় হাজার বৎসরে নয়টি মাথা সে এইরূপ করিয়া আগুনে দিল। তারপর দশ হাজার বৎসর পূর্ণ হইলে যেই সে তাহার বাকি একটি মাথাও কাটিতে যাইবে, অমনি ব্রহ্মা আসিয়া বলিলেন, 'দশগ্রীব, আমি খুশী হইয়াছি, এখন তুমি বর লও।'

দশগ্রীব বলিল 'আমাকে অমর করিয়া দিন।' ব্রহ্মা বলিলেন 'সেটি হইবে না, অন্য বর লও।' দশগ্রীব বলিল, 'তবে এই বর দিন যে, দেব, দানব, দৈত্য, যক্ষ, রক্ষ, নাগ, পক্ষী, ইহারা কেহই আমাকে মারিতে পারিবে না।' ব্রহ্মা বলিলেন 'আচ্ছা, তাহাই হইবে। তাহা ছাড়া, তোমার যে মাথাগুলি কাটিয়া দিয়াছ, তাহাও ফিরিয়া পাইবে। ইহার উপর আবার যখন যেরূপ তোমার ইচ্ছা হয়, তেমনি চেহারা করিতে পারিবে।'

কুম্ভকর্ণ আর বিভীষণও এই দশ হাজার বৎসর ধরিয়া খুব তপস্যা করিয়াছিল, সুতরাং ব্রহ্মা তাহাদিগেও বর দিতে গেলেন। বিভীষণ বলিল, 'আমাকে দয়া করিয়া এই বর দিন যেন ধর্মে আমার মতি থাকে।' এ কথায় ব্রহ্মা অতিশয় তুষ্ট হইয়া তাহাকে সে বর ত দিলেনই, তাহা ছাড়া তাহাকে অমর করিয়া দিলেন।

কুম্ভকর্ণকে বর দিবার সময় দেবতারা বলিলেন, 'প্রভু, এমন কাজ করিবেন না; এ বেটা বর পাইয়া আমাদের সকলকে খাইয়া ফেলিবে। এর মধ্যেই কত জনকে ধরিয়া খাইয়াছে।'

তাইত! এখন তবে কি করা যায়? তপস্যা করিয়াছে কাজেই বর দিতেই হইবে; আবার বর দিলেও বিপদের কথা। তখন ব্রহ্মা বুদ্ধি করিয়া সরস্বতীকে কুম্ভকর্ণের মুখের ভিতরে ঢুকাইয়া দিলেন। সরস্বতী ঢুকিতেই তাহার মাথায় কি যে গোল লাগিয়া গেল, আর বেচারা ঠিক করিয়া কথা কহিতে পারিল না। ব্রহ্মা বলিলেন, 'কুম্ভকর্ণ, কি চাহ?' কুম্ভকর্ণ বলিল, আমি খালি ঘুমাইতে চাই! ছয় মাস ঘুমাইয়া 'একদিন উঠিয়া খাইব।' ব্রহ্মা বলিলেন, 'বেশ কথা! তাই হোক!' এই বলিয়া দেবতাদিগকে লইয়া চলিয়া গেলেন, আর কুম্ভকর্ণ মাথা

চুলকাইতে চুলকাইতে ভাবিল, 'তাইত! এটা কি বলিলাম? দেবতা বেটারা আমাকে ফাঁকি দিয়া গেল নাকি?'

যা হোক আমরা দশগ্রীবের কথা বলিতেছি। সে ত বর পাইয়া নিতান্তই ভয়ংকর হইয়া উঠিল, এখন আর কেহ তাহার কোন কথায় না বলিতে ভরসা পায় না। দশগ্রীবের এক দাদা ছিলেন, তাঁহার নাম কুবের। তিনিও বিশ্রবা মুনির পুত্র, তাঁহার মাতা ভরদ্বাজ মুনির কন্যা দেববর্ণিনী। কুবের লংকায় বাস করিতেন। দশগ্রীব তাঁহাকে বলিয়া পাঠাইল, 'দাদা! লংকাপুরীখানি আমাকে ছাড়িয়া দাও!' কাজেই তখন আর কুবের কি করেন? ভালয় ভালয় না দিলে জোর করিয়া কাড়িয়া নিবে। তাহার চেয়ে তিনি কৈলাস পর্বতে বাস করিতে লাগিলেন। দশগ্রীবও তখন পরম আনন্দে রাক্ষসের দল-সমেত লংকায় আসিয়া রাজা হইয়া বসিল।

ইহার কিছুদিন পরেই দশগ্রীব বিদ্যুজ্জিহ্ব নামক দানবের সহিত সূর্পনখার বিবাহ দিল। তাহাদের তিন ভাইয়ের বিবাহ হইতেও আর বেশী বিলম্ব হইল না। কিন্তু হায়, শুভকার্য শেষ হইতে না হইতেই ব্রহ্মার আজ্ঞায় ঘোর নিদ্রা আসিয়া কুম্ভকর্ণকে ধরিয়া বসিল! তাহার চোখ বুজিয়া আসিল, মাথা ঢুলিয়া পড়িল, সে বিকট মুখে হাই তুলিয়া বলিল, 'দাদা বড়ই ঘুম পাইয়াছে, আমার শয়নের জন্য ঘর করিয়া দাও।' তখনই রাবণের হুকুমে চমৎকার ঘর প্রস্তুত হইল। তাহার ভিতরে গিয়া সেই যে কুম্ভকর্ণ শুইল, হাজার হাজার বৎসরেও আর উঠিল না।

এদিকে দশগ্রীবের জ্বালায় ত্রিভুবন অস্থির। সে দেবতা, গন্ধর্ব, মুনি, ঋষি কাহাকেও মানেনা, এক ধার হইতে সকলকে মারিয়া তাহাদের বাড়ী, ঘর, বাগান সব চুরমার করিতে আরম্ভ করিয়াছে। কুবের ইহাতে নিতান্ত দুঃখিত হইয়া, তাহাকে বারণ করিবার জন্য দূত পাঠাইলেন। সে দূতের কথা দশগ্রীব ত শুনিলই না, লাভের মধ্যে বেচারাকে কাটিয়া রাক্ষসদের খাইতে দিল। তারপর রথে চড়িয়া এই বলিয়া বাহির হইল যে, 'আমি ত্রিভুবন জয় করিব।'

বাহির হইয়াই সে সকলের আগে গিয়া কুবেরের নিকট উপস্থিত হইল—তাঁহার উপরেই রাগটা বেশী। কুবেরের যক্ষেরা অনেক যুদ্ধ করিয়াও তাহার কিছুই করিতে পারিল না। দশগ্রীবের সঙ্গে ভীষণ রাক্ষসেরা গিয়াছিল; তাহারা এমন দুর্গতি করিল যে তাহা আর বলিবার নহে। যক্ষেরা সোজাসুজি সরলভাবে যুদ্ধ করে, আর রাক্ষসেরা নানারকম ফাঁকি দেয়; কাজেই যক্ষেরা হারিয়া গেল। কুবের নিজে আসিয়াও বিশেষ কিছুই করিতে পারিলেন না। দশগ্রীব তাঁহাকে অস্ত্রের আঘাতে অজ্ঞান করিয়া তাঁহার 'পুষ্পক' নামক রথখানি লইয়া চলিয়া গেল। সে রথ বড়ই আশ্চর্য্য ছিল। তাহাতে সঙ্গে দানাপানি, সইস কোচমান কিছুই দরকার হইত না; সেখানে যাইবার হুকুম পাইত, অমনি সে উড়িয়া গিয়া সেখানে হাজির হইত।

সেই পুষ্পক রথে চড়িয়া দশগ্রীব স্বর্গের বিশাল শরবনে উপস্থিত হইল। পর্বতের উপরে সে অতি পবিত্র বন, কার্তিকেয়ের জন্মস্থান, তাহার উপর দিয়া কোন রথেরই যাইবার হুকুম নাই; বিশেষতঃ শিব আর পার্বতী তখন সেখানে ছিলেন। কাজেকাজেই পুষ্পক রথ সেখানে গিয়া আটকাইয়া গেল। ইহাতে দশগ্রীব যারপরনাই আশ্চর্য হইয়া নানারূপ চিন্তা করিতেছে, এমন সময় শিবের দূত নন্দী আসিয়া তাহাকে বলিল যে, 'দশগ্রীব, মহাদেব এখানে আছেন, তুমি ফিরিয়া যাও।'

নন্দীর চেহারা বড়ই অদ্ভুত ছিল। ছোট্টখাট্ট পিঙ্গলবর্ণ লোকটি, হাত দুখানি এতটুকু, মাথাটি নেড়া, মুখখানি বানরের মত। দশগ্রীব তাহার কথা শুনিবে কি, সে হাসিয়াই অস্থির! কিন্তু নন্দী ছাড়িবার পাত্র নহে। সে ছোট হইলেও দেখিতে বড়ই ষণ্ডা, তাহাতে আবার হাতে ভয়ংকর শূল। দশগ্রীব রাগের ভরে রথ হইতে নামিয়া সবে বলিয়াছিল, 'কেরে তোর

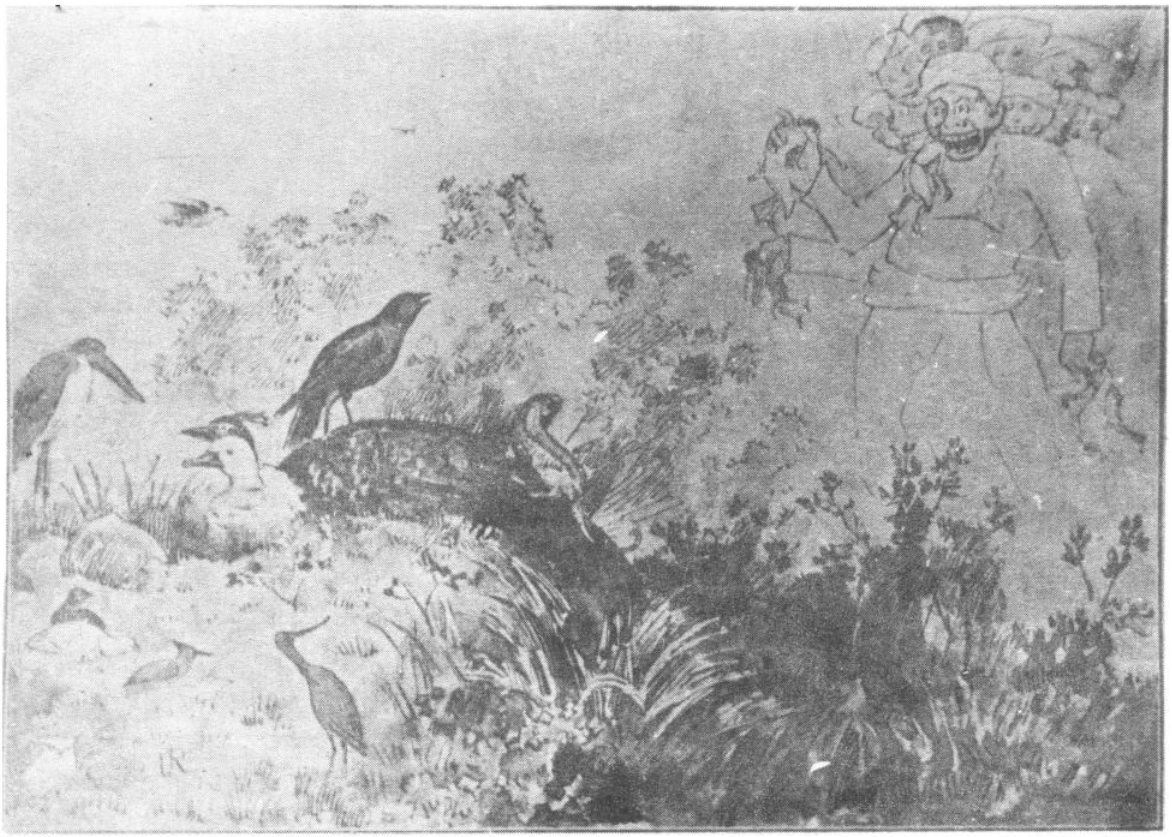

মহাদেব ?' অমনি নন্দী তাহাকে দুই ধমক লাগাইয়া দিল। তখন সে ভারি চটিয়া বলিল, 'বটে ? আমাকে যাইতে দিবিনা ? আচ্ছা দাঁড়া ! তোদের পাহাড় আমি তুলিয়া নিব !'

এই বলিয়া সত্য সত্যই সে কুড়িহাতে সেই পর্ব্বতের তলা ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল। সে কি যেমন তেমন টান ? টানের চোটে পর্ব্বত নড়িয়া উঠিল, শিবের ভূতগুলি ভয় কাঁপিতে লাগিল, পার্ব্বতী যারপরনাই ব্যস্ত হইয়া মহাদেবকে জড়াইয়া ধরিতে গেলেন। মহাদেব কিন্তু কিছুমাত্র ব্যস্ত হইলেন না। তিনি কেবল পায়ের বুড়ো আঙ্গুলটি দিয়া পর্ব্বতখানিকে একটু চাপিয়া ধরিলেন তাহাতেই সে তাহার জায়গায় বসিয়া গেল, আর অমনি, দরজার কামড়ে দুষ্টু খোকার আঙ্গুল আটকাইবার মতন, দশগ্রীব মহাশয়ের হাত কখানিও পর্ব্বতের চাপনে আটকাইয়া গেল।

তখন ত দশগ্রীব দশমুখে ভ্যা-ভ্যা শব্দে চ্যাঁচাইয়া অস্থির। চীৎকারে ত্রিভুবন কাঁপিতে লাগিল। সাগর উছলিয়া উঠিল, দেবতারা ছুটিয়া পথে বাহির হইলেন।

হাজার বছর ধরিয়া দশগ্রীব ঐরূপ চাঁচাইয়াছিল ; আর মহাদেবকে ক্রমাগত মিনতি করিয়াছিল। মহাদেবের দয়ার কথা সকলেই জানে, বেচারার এই কষ্ট দেখিয়া তিনি আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাকে ছাড়িয়া ত দিলেনই, তাহার উপর আবার ভারী ভারী কয়েকটা অস্ত্রও তাহাকে দিয়া দিলেন, আর বলিলেন, 'দশগ্রীব, তুমি চমৎকার চ্যাঁচাইয়াছিলে, তোমার চীৎকারে সকলেই ভয় পাইয়াছিল, অতএব এখন হইতে তোমার নাম 'রাবণ' (যে চীৎকারে লোকের ভয় লাগাইয়া দেয়) হইল।' দশগ্রীব দেখিল, পাহাড় চাপা পড়িয়া মোটের উপর তাহার লাভই হইয়াছে, কাজেই সে খুব খুসী হইয়া সেখান হইতে চলিয়া আসিল।

* * *

দশগ্রীব শিবের নিকট বর পাইয়া 'রাবণ' হইল, অস্ত্রশস্ত্রও অনেক গুলি পাইল। তখন হইতেই সে ব্রহ্মাণ্ডময় কেবল ঘুরিয়া বেড়ায়। আর রাজা রাজড়া যাহাকে সামনে পায় তাহাকেই বলে। 'হয় যুদ্ধ কর, না হয় হার মান !'

উবীর বীজ নামে একটা জায়গায় মরুত্ত নামে এক রাজা যজ্ঞ করিতেছেন, রাবণ পুষ্পক রথে চড়িয়া হেইয়ো হেইয়ো শব্দে সেখানে আসিয়া উপস্থিত। যজ্ঞের স্থানে দেবতাদের অনেকই ছিলেন। রাবণকে দেখিয়াই ভয়ে তাঁহাদের মুখ শুখাইয়া গেল। ছুটিয়া যে পলাইবেন, এতটুকু ভরসাও তাঁহাদের হইলনা, —কি জানি, পাছে ধরিয়া ফেলে। তাই তাঁহারা সেইখানেই নানা জন্তুর বেশ ধরিয়া লুকাইয়া রহিলেন। ইন্দ্র হইলেন ময়ূর, ধর্ম্ম হইলেন কাক, কুবের হইলেন গিরগিটি, বরুণ হইলেন হাঁস।

এদিকে মরুত্তের সঙ্গে রাবণের খুবই যুদ্ধ বাধিবার যোগাড় দেখা যাইতেছে, গালাগালি আরম্ভ হইয়াছে, মারামারিরও বিলম্ব নাই ; এমন সময় মরুত্তের গুরু সম্বর্ত্ত মুনি তাঁহাকে বলিলেন, 'মহারাজ, যুদ্ধ করিয়া কাজ নাই, কেন না তাহা হইলে তোমার যজ্ঞ নষ্ট হইয়া যাইবে, তাহাতে সর্বনাশ হইবে।' কাজেই মরুত্ত চুপ করিয়া গেলেন, আর রাবণ, 'জিতিয়াছি! জিতিয়াছি!' বলিয়া খুবই বাহাদুরী করিতে লাগিল। তারপর, সেখানে যত মুনি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহাদের সকলকে খাইয়া, যারপরনাই খুসী হইয়া সে সেখান হইতে চলিয়া গেল।

তখন দেবতা মহাশয়রা আবার যার যার বেশ ধরিয়া মনে করিলেন, 'বাবা! বড্ড বাঁচিয়া গিয়াছি!' যে সকল জন্তুর সাজ তাঁহারা নিয়াছিলেন, তাহাদের উপরে অবশ্য তাঁহারা খুবই খুসী হইলেন আর তাহাদিগকে বর দিতে লাগিলেন।

ইন্দ্র ময়ূরকে বলিলেন 'তোমার সাপের ভয় থাকিবেনা, আর আমার যেমন হাজার চোখ, তোমার লেজেও তেমনি হাজার চোখ হইবে।' ময়ূরের লেজে আগে শুধুই নীলবর্ণ ছিল, তখন হইতে তাহাতে চমৎকার চক্র দেখা দিল।

ধর্ম্ম কাককে বলিলেন, 'তোমার আর কোন অসুখ হইবে না। মরণের ভয়ও তোমার দূর হইল ; কেবল, মানুষে যদি মারে তবেই তোমার মৃত্যু হইবে।'

বরুণ হাঁসকে বলিলেন, 'তোমার গায়ের রং ধবধবে শাদা হইবে।' তখন হইতে হাঁস শাদা হইয়াছে, আগে তাহার আগাগোড়া শাদা ছিল না, পাখার আগা নীল, আর কোলে'র দিকে ছেয়ে রঙের ছিল।

কুবের গিরগিটিকে বলিলেন, 'তোমার মাথা সোনার মত হইবে।' সেই হইতে গিরিগিটির মাথায় সোনালি রং।

এদিকে রাবণের আর গর্বের সীমাই নাই। দুষ্মন্ত সুরথ গাধি, গয়, পুরূরবা প্রভৃতি বড় বড় রাজারা তাহার নিকট হার মানিয়া গেলেন, অন্যের ত কথাই নাই। কিন্তু অযোধ্যার রাজা অনরণ্য কিছুতেই তাহার নিকট হার মানিতে রাজী হইলেন না। তিনি আগেই অনেক সৈন্য প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন, রাবণ তাঁহার রাজ্যে আসিবামাত্র সেই সকল সৈন্য লইয়া তিনি তাহার সহিত যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিলেন। হায়! তাঁহার সে সৈন্য রাবণের সৈন্যদের হাতে দুদণ্ডের মধ্যেই শেষ হইয়া গেল। নিজেও রাবণের হাতে ভয়ানক আঘাত পাইয়া রথ হইতে পড়িয়া কাঁপিতে লাগিলেন। রাবণ তখন তাঁহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, 'কি? আমার সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এখন কেমন হইল?' অনরণ্য বলিলেন, 'মরিতে ত একদিন সকলকেই হয়, কিন্তু আমি তোমার কাছে হটি নাই, যুদ্ধ করিয়া প্রাণ দিতেছি আর আমি একথা তোমাকে বলিতেছি যে, আমাদের এই বংশে দশরথের পুত্র রামের জন্ম হইবে, সেই রামের হাতে তুমি তোমার উচিত সাজা পাইবে।'

রাজার কথা শেষ হইতে না হইতেই, দেবতারা তাঁহার উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে লাগিলেন, স্বর্গে দুন্দুভি বাজিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে রাজাও দেহ ছাড়িয়া সেখানে চলিয়া গেলেন।

* * *

একবার রাবণ মানুষ তাড়াইয়া ফিরিতে ফিরিতে দেখিল যে মেঘের উপর দিয়া নারদ মুনি হরিনাম গান করিতে করিতে আসিতেছেন। রাবণ তাঁহাকে নমস্কার করিয়া বলিল, 'কি ঠাকুর মহাশয়! মঙ্গল ত? কি জন্য আসিয়াছেন? নারদ বলিল, 'আসিয়াছি যে বাপু, একটা কথা আছে। এই সব মানুষ যখন মৃত্যুর বশ, তখন এরা ত মরিয়াই রহিয়াছে। ইহাদিগকে মারিবার জন্য তুমি আবার এত পরিশ্রম কেন করিতেছ? ইহারা আপনা-আপনিই একদিন যমের বাড়ী যাইবে। বাস্তবিক, যমই যত নষ্টের গোড়া। অতএব, সেই বেটাকে যদি জব্দ করিতে পার, তবে সকলকেই জয় করা হইবে।'

রাবণ বলিল, 'বড় ভাল কথা বলিয়াছেন ঠাকুর মহাশয়, আমি এখনি যাইতেছি।' বলিয়াই আর এক মুহূর্তও দেরী নাই—অমনি রাবণ যমপুরীর পথ ধরিয়াছে! তখন নারদ ভাবিলেন, 'এবার মজাটা হইবে ভাল! যাই একবার দেখিয়া আসি।'

নারদ রাবণের আগেই গিয়া যমের নিকট উপস্থিত হইলেন। যম বিচারাসনে বসিয়া অগ্নি সাক্ষী করিয়া সকলের পাপ-পুণ্যের বিচার করিতেছেন, নারদকে দেখিয়া ব্যস্তভাবে উঠিয়া নমস্কার-পূর্ব্বক বলিলেন, 'মুনিঠাকুরের আজ কি চাই?'

নারদ বলিলেন, 'সাবধান হও বাছা, রাবণ তোমাকে জয় করিতে আসিতেছে। মুস্কিল হইতে আটক নাই, কিন্তু বেটা বড় বেখাপ্পা লোক।'

বলিতে বলিতেই রাবণের পুষ্পক রথও আসিয়া দেখা দিল। রথ হইতে নামিয়াই সে দেখিল যে নরকের কুণ্ডে দলে দলে পাপী সকল যমদূতগণের তাড়নায় চীৎকার করিতেছে। আর কথাবার্তা নাই,—সে যমদূতগুলিকে বিধিমত ঠ্যাঙ্গাইয়া সকল পাপীকে ছাড়িয়া দিল। সে বেচারারা হঠাৎ ছাড়া পাইয়া যে কি আশ্চর্য্য আর খুসী হইল তাহা আর বলিবার নয়। তখন যে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে বড়ই ভয়ঙ্কর। যমপুরীতে অসংখ্য সিপাহী সান্ত্রী থাকে, তাহাদের এক এক জন ভয়ানক যোদ্ধা। তাহারা রাবণ আর তাহার লোকদিগকে মারিয়া রক্তারক্তি করিয়া দিল। মার খাইয়াও কিন্তু রাবণ যুদ্ধ করিতে ছাড়ে না। শূল, শক্তি, প্রাস, গদা, গাছ, পাথর কত যে ছুঁড়িল তাহার লেখাজোখা নাই। তখন যমের লোকেরা আর রাক্ষসকে ছাড়িয়া কেবল রাবণের উপরেই এমন ভয়ানক অস্ত্রবৃষ্টি করিতে লাগিল যে তাহাতে পুষ্পক রথ অবধি ডুবিয়া গিয়া রাবণের দম আটকিয়া মরিবার গতিক! দুর্দশার এক শেষ; রক্তধারায় দেহ ভাসিয়া গেল; কবচ কোথায় গিয়াছে তাহার ঠিক নাই। তখন কাজেই তাহাকে রথ হইতে নামিয়া আসিতে হইল।

এতক্ষণে আর রাবণের বুঝিতে বাকি রহিল না যে এবারে একটু বেগতিক, একটা বড় রকমের অস্ত্র না ছাড়িতে পারিলে আর চলিতেছে না। কাজেই সে তখন ধনুকে পাশুপাত অস্ত্র যুড়িয়া যমের লোকদিগকে বলিল, 'দাঁড়া বেটারা! এবার তোদের দেখাইতেছি!' এই বলিয়া সে সেই ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছুঁড়িবামাত্রই যমের সকল সিপাহি ভস্ম হইয়া গেল। তখন রাবণের আর রাক্ষসগণের সিংহনাদে ব্রহ্মাণ্ড ফাটে আর কি!

সেই সিংহনাদ শুনিয়াই যম বুঝিতে পারিলেন যে রাক্ষসদিগের জয় হইয়াছে। তখন কাজেই রথে চড়িয়া তাঁহাকে স্বয়ংই বাহির হইতে হইল। সে যে কি ভয়ঙ্কর রথ সে কথা আমি বলিয়া বুঝাইতে পারিব না। তাহার উপর আবার স্বয়ং মৃত্যু গ্রাস আর মুদ্গর লইয়া ভীষণ বেশে সম্মুখে দাঁড়াইয়া, কালদণ্ড প্রভৃতি ভয়ঙ্কর অস্ত্র সকল ধূ ধূ করিয়া জ্বলিতেছে।

সেই রথ আর তাহার ভিতর মৃত্যুকে দেখিয়াই রাবণের লোকেরা 'বাপরে! আমাদের যুদ্ধে কাজ নাই!' বলিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে চম্পট দিল। কিন্তু রাবণ তাহাতে ভয় না পাইয়া যমের সঙ্গে খুব

যুদ্ধ করিতে লাগিল। অস্ত্রের ভয় ত তাহার নাই, কারণ সে জানে ব্রহ্মার বরের জোরে সে মরিবে না। কাজেই অনেক খোঁচা যেমন খাইল, খোঁচা দিলও ততোধিক। খোঁচা খাইয়া যম রাগে অস্থির হইয়া উঠিলেন, তাঁহার মুখ দিয়া আগুন বাহির হইতে লাগিল।

তখন মৃত্যু যমকে বলিল, 'আমাকে আজ্ঞা করুন আমি এখনি এই দুষ্টকে মারিয়া দিতেছি। আমি ভাল করিয়া তাকাইলে আর ইহাকে এক মুহূর্তও বাঁচিতে হইবে না।' যম বলিলেন, 'দেখ না, আমি ইহাকে কি সাজা দিই।' এই বলিয়াই তিনি রাগে দুই চোখ লাল করিয়া তাঁহার সেই ভীষণ 'কালদণ্ড' হাতে নিলেন। সে দণ্ড যাহার উপরে পড়ে, তাহার আর রক্ষা থাকে না!

যমকে কালদণ্ড তুলিতে দেখিয়া ভয়ে সকলের প্রাণ উড়িয়া গেল, কে কোন দিক দিয়া পালাইবে তাহার ঠিক নাই, দেবতাদের অবধি বুক ধড়াস ধড়াস করিতেছে। তখন ব্রহ্মা নিতান্ত ব্যস্তভাবে ছুটিয়া আসিয়া যমকে বলিলেন, 'সর্ব্বনাশ! কর কি? এই কালদণ্ড তুমি ছুঁড়িলেই যে আমার কথা মিথ্যা হইয়া যাইবে। কালদণ্ডও আমিই গড়িয়াছি, রাবণকেও আমিই বর দিয়াছি। আমিই বলিয়াছি যে কালদণ্ড কিছুতেই ব্যর্থ হইবেনা, আবার আমিই বলিয়াছি যে রাবণ কোন দেবতার হাতে মরিবেনা। এখন, এই অস্ত্রে যদি রাবণ মরে তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়, যদি না মরে তাহা হইলেও আমার কথা মিথ্যা হয়। লক্ষ্মীটি! আমার মান রাখ, এ অস্ত্র তুমি ছুঁড়িয়ো না।'

কাজেই যম তখন আর কি করেন? তিনি বলিলেন, 'আপনি হইতেছেন আমাদের সকলের প্রভু, সুতরাং আপনার হুকুম মানিতেই হইবে। কিন্তু, যদি এ দুষ্টকে মারিতেই না পারিলাম, তবে আর আমার এখানে থাকিয়াই কি ফল?' এই বলিয়া যম সেখান হইতে চলিয়া গেলেন; তাহা দেখিয়া রাবণ হাততালি দিয়া নাচিতে নাচিতে বলিল, 'দুয়ো! দুয়ো! হারিয়া গেলি! হারিয়া গেলি!!' ততক্ষণে অন্য রাক্ষসদেরও খুবই সাহস হইয়াছে, আর তাহারা আসিয়া 'জয়, রাবণের জয়!' বলিয়া আকাশ ফাটাইতে আরম্ভ করিয়াছে!

* * *

ব্রহ্মার কথায় যম যুদ্ধ ছাড়িয়া দিলেন, রাবণ ভাবিল সেটি তাহার নিজেরই বাহাদুরী। তখন আর তাহার গর্ব্বের সীমাই রহিল না। সে বাছিয়া বাছিয়া বড় বড় যোদ্ধাদের সহিত বিবাদ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। বরুণের পুত্রগণ তাহার নিকট হারিয়া গেলেন। বরুণ নিজে ব্রহ্মার বাড়ীতে গান শুনিতে যাওয়ায় সেখানে উপস্থিত ছিলেননা তাই তাঁহার মান বাঁচিল। সূর্য্য যুদ্ধ না করিয়াই বলিলেন, 'আমি হার মানিতেছি।' রাবণের ভগ্নিপতি বিদ্যুজ্জিহ্ব বেচারাও তাহার হাতে মারা গেল।

কিন্তু সকল জায়গায়ই যে রাবণ বাহাদুরী পাইয়াছিল তাহা নহে। বলির বাড়ীতে গিয়া সে অনেক বড়াই করিয়াছিল। বলি তাহাকে ধরিয়া নিজের কোলে বসাইয়া বলিলেন. 'কি চাও বাপু?' রাবণ বলিল 'শুনিয়াছি বিষ্ণু নাকি আপনাকে আটকাইয়া রাখিয়াছেন। আমি আপনাকে ছাড়াইয়া দিতে পারি।'

এ কথা শুনিয়া বলির ভারী হাসি পাইল। তারপর তিনি তাহাকে বলিলেন, 'যাও ত, ঐ যে চকচকে চাকাটি দেখিতেছ ওটি আমার কাছে লইয়া আইস ত।' এ কথায় রাবণ নিতান্ত অবহেলার সহিত গিয়া সেই জিনিসটা উঠাইল, কিন্তু কিছুতেই সেটাকে লইয়া আসিতে পারিল না। সে লজ্জিত হইয়া প্রাণপণ টানাটানি করিতে করিতে শেষে অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল!

খানিক পরে রাবণের জ্ঞান হইয়াছে, কিন্তু তখন আর লজ্জায় বেচারা মাথা তুলিতে পারে না। তখন বলি তাহাকে বলিলেন, 'এই চাকাটি আমার পূর্ব পুরুষ হিরণ্যকশিপুর কুণ্ডল।'

বিজয়চন্দ্র মজুমদার

বল্লে কথা তোমরা কেউ কর্ব্বে নাক বিশ্বাস,
একদিন এক রাক্ষসী টেনেছে যেই নিঃশ্বাস,
মস্ত দুটো হাতী তার দুটি নাকে ঢুকল,
নাক হল বন্ধ তার, নিশ্বাস নেওয়া চুকল।
নাকের ছেঁদার মাঝে হাতী নাড়ে খালি শুঁড়ই,
বেরোবার নাম নেই, হাঁপিয়ে পড়ল বুড়ী।
শুঁড় ধরে টানাটানি করে যত রাক্ষসে,
দম আটকে বুড়ী গিয়ে গাছ পাহাড়ে নাক ঘসে।
নাকে মারে লাঠির ঘা, নাক ফুলে উঠল,
কেউ বা নাক কাটবে বলে ছুরি নিয়ে জুটল।

বেগতিক দেখে তখন রাক্ষসী না ছুটে,
বুদ্ধিমান এক মানুষের পড়ল পায়ে লুটে।
শপথ করায় বুড়ীকে সে, বুদ্ধিমানের ঝানু সে,
কর্বে নাক ক্ষুধার শান্তি কখ্খনো আর মানুষে।
দুশ মন নস্য তার নাকে গুঁজে হাঁচিয়ে,
বুদ্ধিমান দিল তখন রাক্ষসীরে বাঁচিয়ে।
ছটকে পড়ল হাতী দুটো দুক্রোশ দূরের পাহাড়ে,
সেদিন থেকে রাক্ষসেরা নিরামিষ আহারে
লাগল সবে। বাঁচল মানুষ! দেশের হাড় জুড়োল,
নটে গাছটি মুড়োল আর আমার কথা ফুরোল।

বানর রাজপুত্র

উপেন্দ্রকিশোর রায়

এক রাজার সাত রাণী, কিন্তু ছেলে পিলে একটিও নাই। রাজার তাতে বড়ই দুঃখ ; তিনি সভায় গিয়ে মাথা গুঁজে বসে থাকেন, কেউ এলে ভাল করে কথা ক'ন না।

এক দিন হয়েছে কি,—এক মুনি রাজার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন। মুনি রাজার মুখ ভার দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, "রাজা, তোমার মুখ যে ভার দেখছি ; তোমার কিসের দুঃখ ?"

রাজা বল্লেন, "সে কথা আর কি বলব মুনি ঠাকুর ? আমার রাজ্য ধন, লোক জন সবই আছে, কিন্তু আমার যে ছেলে পিলে নাই, আমি মরলে কে দেখবে ?

মুনি বল্লেন, "এই কথা ? আচ্ছা, তোমার কোন চিন্তা নাই। কাল ভোরে উঠেই তুমি উত্তর দিকে চলে যাবে। অনেক দূর গিয়ে একটা বনের ধারে দেখবে একটা আম গাছ রয়েছে। সেই আমগাছ থেকে সাতটি আম এনে তোমার সাত রাণীকে খাইয়ে দিলেই তোমার সাতটি ছেলে হবে। কিন্তু খবরদার আম নিয়ে আসবার সময় পিছনের দিকে তাকিয়ো না যেন !"

এই কথা বলে মুনি চলে গেলেন। তার পরদিন গেল, রাত হল, ক্রমে রাত ভোর হল। তখন রাজা মশাই তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে সোজা সুজি উত্তর দিকে চলতে লাগলেন। যেতে যেতে অনেক দূর গিয়ে তিনি দেখলেন, সত্যি সত্যি বনের ধারে একটা আম গাছ আছে, তাতে পাকা পাকা সাত সাতটি আমও দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সেই বনে তিনি কত বার শিকার কর্ত্তে এসেছেন, কিন্তু আম গাছ কখনো দেখতে পাননি। যা হোক ; তিনি তাড়াতাড়ি সেই গাছে উঠে আম সাতটি পেড়ে নিয়ে বাড়ীতে ফিরে চল্লেন।

খানিক দূরে যেতে না যেতেই তিনি শুন্‌লেন, কে যেন পিছন থেকে তাঁকে ডাকছে,

"ওগো রাজা, ফিরে চাও,
আরো আম নিয়ে যাও।"

মুনি যে সাবধান করে দিয়েছিলেন, সে কথা রাজার মনে ছিল না। তিনি পিছন থেকে ডাক শুনেই ফিরে তাকিয়েছেন, আর অমনি আমগুলো তাঁর হাত থেকে ছুটে গিয়ে আবার গাছে ঝুলতে লেগেছে ! কাজেই রাজামশাইকে ত আবার গিয়ে গাছে উঠে আমগুলি পেড়ে আনতে হল। এবার আর তিনি কিছুতেই মুনির কথা ভুললেন না। তিনি চলে আসবার সময় পিছন থেকে তাঁকে কত রকম করে ডাকতে লাগল, 'চোর' 'চোর' বলে কত গালও দিল। রাজা মশাই তাতে কোন কান না দিয়ে বোঁ বোঁ করে বাড়ী পানে ছুটলেন।

বাড়ী এসে রাণীদের হাতে সাতটি আম দিয়ে আম দিয়ে রাজা মশাই বল্লেন, "তোমরা সাত জনে এই সাতটি আম বেঁটে খাও।"

ছোট রাণী তখন সেখানে ছিলেন না। বড় রাণীরা ছ' জনে মিলে তাঁকে কিছু না বলেই সব কটি আম খেয়ে ফেল্লেন। ছোট রাণী কিছু জানতে পার্‌লেন না, কিন্তু তাঁর ঝি সব দেখল। বড় রাণীদের খাওয়া হয়ে গেলে সে আমের ছাল গুলি চুপি চুপি কুড়িয়ে নিয়ে গেল। সেই ছালগুলো ধুয়ে, বেটে ছোটরাণীর হাতে দিয়ে বল্ল, "মা, এই ওষুদটা খাও, তোমার ভাল হবে।" ওষুধ খেতে হয়, তাই ছোট রাণী আর কোন কথা না বলেই সেটা খেয়ে ফেল্লেন।

তার পর রাণীদের সকলেরই এক একটি সুন্দর খোকা হল। রাজা তাতে খুসী হয়ে খুব ধুমধাম আর গান বাজনা করালেন। ছোট রাণীরও খোকা হল কিন্তু সেটি হল বানর। বানর দেখে রাজা চটে গিয়ে ছোট রাণীকে বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দেশের লোকের তাতে বড়ই দুঃখ হল। তারা একটি কুঁড়ে বেঁধে ছোট রাণীকে বল্ল, 'মা তুমি এইখানে থাক।"

সেইখানে ছোট রাণী থাকেন। বানরটি সেখান থেকে দিন দিন বড় হচ্ছে। সে মানুষের

মত কথা কয়। আর তার এমনি বুদ্ধি যে, কোন কথা তাকে শিখিয়ে দিতে হয় না। যখন যে কাজের দরকার, অমনি সে তা করে। সারাদিন সে গাছে গাছে ঘুরে বেড়ায়, যেখানে যে ফল দেখে তা খায়; খুব ভাল লাগলে মার জন্য নিয়ে আসে। তাকে কেউ কিছু বলে না, কারুর গাছের ফল খেতে গেলে সে ভারী খুসী হয়ে ভাল ভাল ফল দেখিয়ে দেয়। তার বুদ্ধি দেখে সকলে আশ্চর্য্য হয়ে যায়।

এমনি করে দিন যাচ্ছে। বড় রাণীদের ছটি ছেলেও এখন বেশ বড় হয়েছে। তারা বানরটিকে যারপর নাই হিংসা করে, সে তাদের সঙ্গে খেলা করতে গেলে তাকে মেরে তাড়িয়ে দেয়।

তার পর একদিন বানরটি দেখল যে বড়-রাণীদের ছেলেদের জন্য মাষ্টার এসেছে, তারা পুঁথি নিয়ে তার কাছে বসে পড়ে। তা দেখে বানর দিয়ে তার মাকে বল্ল, "মা আমাকে পুথি এনে দাও, আমি পড়্‌ব।"

মা কাঁদতে কাঁদতে বল্লেন, "হায় বাছা, কি করে পড়বে? তুমি যে বানর।"

বানর বল্ল, 'সত্যি মা, আমি পড়ব; তুমি আমাকে পড়াবে।"

বানরের এমনি বুদ্ধি, যে বই পায় সে দুদিনে শেষ করে ফেলে। সে দুবছরে মস্ত পণ্ডিত হয়ে উঠল। বড় রাণীদের ছেলেরা তখনো দু'তিন খানি বই পুঁথি শেষ করতে পারে নি; রোজ খালি মাষ্টারের বকুনি খায়।

এ সব কথা শুনে রাজা এক দিন বল্লেন, "বটে? বানরের এমনি বুদ্ধি? নিয়ে এস ত তাকে আমি দেখ্‌ব।"

বানরের কিছুতেই ভয় নাই; রাজা ডেকেছেন শুনে সে অমনি তাঁর কাছে উপস্থিত হল। তাকে দেখে আর কথাবার্ত্তা শুনে রাজার এমনি ভাল লাগল যে, তিনি আর কিছুতেই ছোট রাণীকে কুঁড়ে ঘরে ফেলে রাখতে পারলেন না। বাড়ীতে আনতেও ভরসা পেলেন না, পাছে বড় রাণীরা কিছু বলেন।

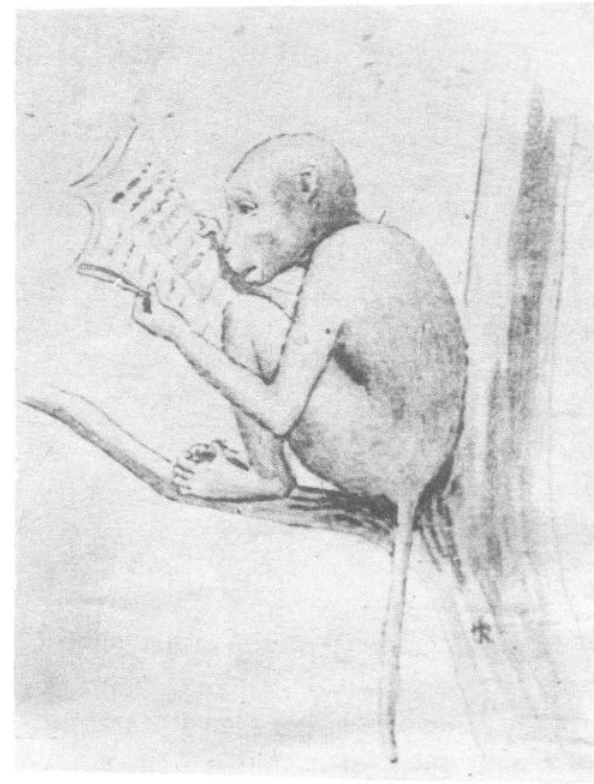

তাই তিনি ছোট রাণীকে রাজ বাড়ীর পাশেই একটি খুব সুন্দর বাড়ী করে দিলেন। সেই বাড়ীতে তখন থেকে ছোট রাণী তাঁর বানর নিয়ে থাকেন। টাকা কড়ি যত লাগে রাজার লোক এসে দিয়ে যায়; লোকে তার বাড়ীটাকে বলে বানরের বাড়ী। এ সব দেখে বড় রাণীদের ছেলেরা বানরকে আরো বেশী করে হিংসা করতে লাগল।

একটু একটু করে ছেলেরা সব বড় হয়ে উঠল। সকলে রাজাকে বল্ল, "রাজপুত্রেরা বড় হয়েছেন, এখন এঁদের বিয়ে দিয়ে দিন।"

রাজা বল্লেন, "তাদের দেশ বিদেশ ঘুরতে দাও। তারা নানান জায়গা দেখে নানান রকম শিখে, টুক্‌টুকে ছয়টি রাজকন্যা বিয়ে করে আনুক।"

সকলে বল্ল, "বেশ বেশ! তাই হোক।"

তার পর ছয় পুত্র সেজে গুজে, টাকা কড়ি সঙ্গে নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে নানান দেশ দেখতে বেরুল। তা দেখে বানর তার মাকে গিয়ে বল্ল, "মা, আমিও যাব।"

তার মা বল্লেন, "তুমি কি করতে যাবে

যাদু, তোমাকে কোন্ টুক্‌টুকে রাজকন্যা বিয়ে করবে ?"

বানর বল্ল, "নাই বা করল মা ; আমি ত নানান দেশ দেখে আস্‌তে পারব।"

মা বল্লেন, "তুমি যে দেশ দেখতে যাবে আমি তোমাকে ছেড়ে কি করে থাক্‌ব ?"

বানর বল্ল, "আমি দেখতে দেখতে ফিরে আসব। তোমার পায় পড়ি মা আমাকে যেতে দাও।"

কাজেই ছোট রাণী আর কি করেন ? বানরকে যেতে দিতেই হল।

ছয় রাজপুত্র ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে ; রাজ বাড়ী থেকে অনেক দূর চলে এসেছেন। একটা বনের ভিতর দিয়ে তাদের পথ, সেই পথে চলতে চলতে তাদের নানা রকম কথা বার্ত্তা হচ্ছে, এমন সময় বনের ভিতর থেকে বানর বেরিয়ে এসে বল্ল, "দাদা আমিও এসেছি, আমাকে সঙ্গে নিয়ে চল।"

তাতে রাজপুত্রেরা যার পর নাই রেগে বল্ল, "বটেরে,তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা ! আমরা রাজকন্যা বিয়ে করে আনতে যাচ্ছি বলে তুইও তাই করতে যাবি ! দাঁড়া, তোকে দেখাচ্ছি।" এই বলে তারা বানরকে ,মারতে মারতে আধ মরা করে একটা গাছে বেঁধে রেখে চলে গেল।

সেই বনে ছিল এক দল ডাকাত। তারা দেখল যে ছয় জন রাজপুত্র ভারী সাজ করে টাকা কড়ি নিয়ে ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। দেখেই ত তারা মার মার করে চার দিক থেকে তাদের ঘিরে ফেল্ল। রাজপুত্রেরা ভয়েই জড় সড়, তলোয়ার খুলবার কথা আর তাদের মনেই নেই। তাদের টাকা কড়ি, ঘোড়া পোশাক, সব শুদ্ধ তাদের হাত পা বেঁধে নিয়ে যেতে তাদের দু'মিনিটও লাগল না।

রাজপুত্রদের ধরে নিয়ে খানিক দূরে এসেই ডাকাতেরা দেখল পথের ধারে একটা বানর বাঁধা রয়েছে। তাকেও তারা সঙ্গে করে নিয়ে চল্ল। বানর যেন তাতে বেশ খুসী হয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে তাদের সঙ্গে যেতে লাগল। তা দেখে ডাকাতরা ভাবল বুঝি কারু পোষা বানর, কাজেই তাকে আর তারা তেমন করে বাঁধল না।

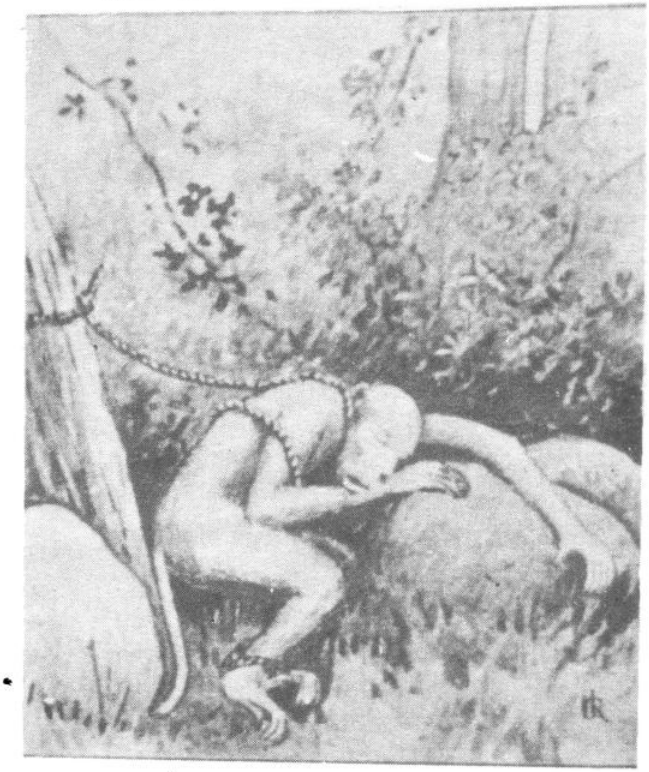

সেই বনের ভিতরেই ডাকাতদের ঘর। সে দিন তাদের বড্‌ড পরিশ্রম হয়েছিল, তাই রাজপুত্রদের নিয়ে সন্ধ্যার সময় ঘরে ফিরে এসে বাঁধন শুদ্ধই ছটি ভাইকে একটা জায়গায় ফেলে রেখে তারা খাওয়া দাওয়া করে ঘুমিয়ে পড়ল। যখন খুব করে তাদের নাক ডাকতে লেগেছে, তখন বানর চুপি চুপি তার নিজের বাঁধন দাঁত দিয়ে কেটে তাড়াতাড়ি গিয়ে রাজপুত্রদের বাঁধন খুলে দিয়েছে। তখন আর তারা বানরকে ফেলে যাবে কোন লাজে ? কাজেই তাকেও সঙ্গে করে, জিনিসপত্র নিয়ে, ঘোড়ায় চড়ে অমনি তারা প্রাণপণে ছুট দিল, ডাকাতেরা কিছু টের পেল না।

ডাকাতদের ওখান থেকে পালিয়ে রাজপুত্রেরা

প্রাণপণে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে লাগ্‌ল, ভোরের আগে আর তারা কোথাও থাম্‌ল না। সকালে তারা দেখল যে তারা ভারী চমৎকার একটা সহরে এসে উপস্থিত হয়েছে। সে খুব বড় এক রাজার দেশ; তাঁর বাড়ী দূর থেকে দেখা যাচ্ছে যেন একটা ঝক্‌ঝকে শাদা পাহাড়।

ছয় রাজপুত্র সেই বাড়ীর কাছে গিয়ে টক্‌ টক্‌ করে ঘোড়া হাঁকিয়ে তার ভিতরে ঢুকে পড়্‌ল। দারোয়ানেরা তাদের পোশাক আর ঘোড়ার সাজ দেখে জড় সড় হয়ে দাঁড়িয়ে তাদের সেলাম কর্‌ল আর কিছু বল্‌ল না। বানর কিন্তু জানে যে সে সেখানে গেলেই তাকে ধরে ফেলবে; তাই সে রাজবাড়ীর পিছনের দিকে গিয়ে, খিড়কীর পুকুরের ধারে শুয়ে রইল।

সেই দেশের রাজারও ছিল সাত রাণী। তাদের বড় ছজন ছিল ভারী হিংসুকে আর দেখতে বিশ্রী, আর ছোটটি ছিলেন পরীর মত সুন্দর আর বড় লক্ষ্মী। বড়রা রাজাকে মিছা-মিছি নানান্‌ কথা বলে ছোট রাণীকে ঘর থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল; তিনি খিড়কীর পুকুরের ধারে একটি কুঁড়ের ভিতর থাক্‌তেন, রাজা তাঁর কোন খবরও নিতেন না। বড় ছয় রাণীর ছটি মেয়ে ছিল, তারা দেখ্‌তে ছিল ঠিক তাদের মায়ের মতন, আর তাদের মনও ছিল তেমনি। আর ছোট রাণীর যে মেয়েটি ছিল, সেও ছিল ঠিক তার মার মত—তেমনি সুন্দর, তেমনি লক্ষ্মী। তা হলে কি হয়, বড় রাণীরা রাজাকে বুঝিয়ে দিয়েছিল যে, ছোট রাণীর মেয়েটা পাগল, কালো, কুঁজো, কাণা, খোঁড়া, কালা আর বোবা।

সেই খিড়কীর পুকুরের ধারে, সেই ছোট-রাণীর কুঁড়ে ঘরের কাছে বানর গিয়ে শুয়ে রয়েছে। খানিক বাদে বড় রাণীদের ছয় মেয়ে ছ'টি ঘটী নিয়ে সেখানে স্নান কর্‌তে এল, ছোটরাণীর মেয়েটীও তার ছোট্ট ঘটীটি নিয়ে এল। তারা স্নান করে চলে আসবার সময় সেই মেয়েটির ঘটী থেকে কেমন করে খানিকটা

জল বানরের গায়ে পড়েছিল। অমনি বড় রাণীদের ছয় মেয়ে হাততালি দিয়ে চেঁচিয়ে বল্‌তে লাগল, "ওমা! ওমা! তোমরা দেখ এসে;—ছোটরাণীর মেয়ে বাঁদরটাকে বিয়ে করেছে!" বড় রাণীরাও তা শুনে ছুটে এসে বল্‌তে লাগল, "তাই ত, তাই ত! ছোটরাণীর মেয়ে বাঁদরটাকে বিয়ে করেছে।"

সেই খবর তখনি তারা রাজার কাছে পাঠিয়ে দিল। দেশের সকল লোক রাজার সভায় বসে শুন্‌ল যে ছোটরাণীর মেয়ের একটা বানরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে।

ছোট রাণীর মনে যে কি কষ্ট হল, তা আর কি বলব? তিনি খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়ে, মেয়েটিকে বুকে নিয়ে মাটিতে পড়ে খালি কাঁদতে লাগলেন। তা দেখে বানর তাঁদের ঘরের দরজায় এসে বাইরে থেকে হাত জোড় করে বল্‌ল, 'মা, আপনি কাঁদবেন না। ভগবান যা করেন ভালই করেন; এ থেকেও আপনাদের ভাল হতে পারে।' বানরকে মানুষের মত কথা কইতে দেখে রাণী চম্‌কে উঠে বস্‌লেন। তাঁর মনের দুঃখ যেন কোথায় চলে গেল। সেই

থেকে বানর তাঁর ঘরের কাছে গাছের উপরে থাকে, আর প্রাণপণে তাঁর সেবা করে। রাণী যখন শুনলেন যে সে রাজপুত্র, তখন সে যে বানর, সে কথা তিনি ভুলে গেলেন ; তাঁর মনে হল যে এমন ভাল আর বুদ্ধিমান লোক মানুষের ভিতরে নাই।

এদিকে হয়েছে কি, সেই ছয় রাজপুত্রও রাজার বাড়ীতে ঢুকে একেবারে তাঁর সভায় এসে হাজির হয়েছে ; রাজা দেখেই বুঝতে পেরেছেন, এরা রাজপুত্র। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, "বাপু, তোমরা কে ? কি কর্‌তে এসেছ ?" তারপর যখন তাদের বাপের নাম শুন্‌লেন, আর শুনলেন যে তারা বিয়ে করবার জন্যে রাজকন্যা খুঁজতে বেরিয়েছে, তখন ত আর তাঁর খুসীর সীমাই রইল না। তিনি বল্লেন, "বাঃ! তোমরা যে আমার বন্ধুর ছেলে! বেশ হল, আমার ছয় মেয়েকে তোমরা ছজনে বিয়ে করবে।"

ঠিক এমনি সময় বাড়ীর ভিতর থেকে খবর এল যে, ছোট রাণীর মেয়ের একটা বাঁদরের সঙ্গে বিয়ে হয়েছে। রাজপুত্রেরাও তখনি বুঝে নিল যে এ আর কেউ নয়, তাদেরি বাঁদর। তাদের মনে হিংসাটা যে হল! বাঁদর এসে তাদের আগেই রাজার মেয়ে বিয়ে করে ফেল্ল,—লোকে আবার কাণাকাণি করে বলে যে সে মেয়ে না কি রাজার আর ছয় মেয়ের চেয়ে ঢের বেশী সুন্দর আর ভালো—এ সব কথা তারা যত ভাবে ততই খালি হিংসায় জ্বলে মরে।

যা হোক, রাজার ছয় মেয়ের সঙ্গে ত তাদের ছ'জনের বিয়ে হয়ে গেল, তারপর ঝক্‌ঝকে ময়ূরপঙ্খী সাজিয়ে ঢাক ঢোল বাজিয়ে তারা বৌ নিয়ে দেশে চল্ল। বানরও একটা ছোট নৌকায় করে তার স্ত্রীকে নিয়ে তাদের পিছু পিছু চলেছে। তাকে দেখেই ছয় রাজপুত্র রেগে ভূত হয়ে গেছে আর ভেবেছে যে একে বৌ নিয়ে দেশে পেঁছিতে দেওয়া হবে না। মুখে কিন্তু 'ভাই' ভাই' বলে ভারী আদর দেখাতে লাগ্‌ল, যেন তাকে কতই ভালবাসে। শেষে যখন বাড়ীর কাছে এসেছে, তখন রাত্রে ঘুমের ভিতরে বেচারার হাত পা বেঁধে তাকে জলে ফেলে দিল। ভাগ্যিস ছোট বৌ টের পেয়ে তাড়াতাড়ি একটা বালিস ফেলে দিয়েছিল, আর তাই ধরে অনেক কষ্টে সে কোন মতে ডাঙ্গায় উঠ্‌ল, নইলে সে যাত্রা আর উপায়ই ছিল না।

তারপর সকাল বেলায় নৌকা এসে ঘাটে লাগ্‌ল, রাজা খবর পেয়ে ছেলে বৌদের আদর করে ঘরে নিতে এলেন। ছয় ছেলে এসে তাঁকে প্রণাম কর্‌ল, রাজা তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, "আমার বানর কই ?' তারা বল্ল, "সে জলে ডুবে মারা গিয়েছে।"

বানর ত মরেনি, সে নদীর ধারে ধারে তাদের আগেই ঘাটে এসে গাছের আড়ালে লুকিয়ে ছিল। ওরা "সে জলে ডুবে মারা গেছে" বলতেই বানর আড়াল থেকে বেরিয়ে এসে রাজাকে প্রণাম করে বল্ল, "আমি মরিনি বাবা, ওরা আমার হাত পা বেঁধে আমাকে জলে ফেলে দিয়েছিল, আমি অনেক কষ্টে বেঁচে এসেছি।"

তখন ত রাজপুত্রদের সকলেরই মুখ চূণ। রাজা ভয়ানক রেগে তাদের বল্লেন, "বটে! তোদের এই কাজ ? দূর হ তোরা আমার দেশ থেকে ; আর তোদের মুখ দেখ্‌ব না।"

এই বলে দুষ্ট ছেলেগুলিকে তাড়িয়ে দিয়ে রাজা যারপর নাই আদরের সহিত বানর আর ছোট বৌকে ঘরে নিয়ে এলেন। বানরের মা ছেলেকে ফিরে পেয়ে আর এমন সুন্দর লক্ষ্মী বৌ ঘরে এনে যে কত সুখী হলেন তা বুঝতেই পার।

তারপর খুব সুখেই তাঁদের দিন কাটতে লাগ্‌ল। এর মধ্যে হয়েছে কি বৌমা দেখলেন যে বানর শুধু দিনের বেলায়ই বানর সেজে বেড়ায় ; রাত্রে সে বানরের ছাল খুলে ফেলে দেবতার মতন মানুষ হয়। এ কথা তিনি ছোট রাণীকে বল্লেন, ছোট রাণী আবার রাজাকে জানালেন। রাজা তা শুনে ভারি

আশ্চর্য্য হয়ে এসে বল্লেন, "বৌমা, এক কাজ কর। আজ রাত্রে যখন সে বানরের ছাল খুলে ঘুমোবে, তখন তুমি সেই ছালটাকে পুড়িয়ে ফেলবে।"

সে দিন বানরের শোবার ঘরের পাশের ঘরে মস্ত আগুন জ্বেলে রাখা হল, বানর তা জান্‌তে পেলনা। তারপর রাত্রে যেই ছাল খুলে রেখে সে ঘুমিয়েছে অমনি রাজকন্যা চুপি চুপি নিয়ে সেটাকে সেই আগুনে ফেলে দিয়েছেন। সকালে বানর উঠে দেখে তার ছাল নাই। তখন সে ত ধরা পড়ে গিয়ে খুবই ব্যস্ত হল, কিন্তু ব্যস্ত হয়ে কি হবে, আর বানর হবার যো নাই। দেখতে দেখতে সেই খবর দেশময় ছড়িয়ে পড়্‌ল, আর, ছেলে বুড়ো সকলে ছুটে এসে, সব দেখে শুনে ধেই ধেই করে নাচ্‌তে লাগ্‌ল।

পাখীর গান

উপেন্দ্রকিশোর রায়

কত পাখী আছে, তাহা কহ মোর কাছে।
আহা, কত মত সাজে তারা ফেরে ধরা মাঝে॥
তারা বলে কত বুলি, তারা করে কত খেলা,
দুখ নাহি কারো মনে, কা'রো কাজে নাহি হেলা॥
নাচে খঞ্জন বাটে মাঠে, আর কোকিল গাহে ডালে,
আর কিবা মনে করে কাক বসে আসি চালে!
মুনি ঠাকুরেরি মত বক থাকে ঝিম ধরে,
মাছ এলে মুখ মেলে তারে গেলে কপ্‌ করে॥
কহে হুতোমেরে প্যাঁচা, 'মুই বলি শোন চাচা'
এই যে হাঁড়ি মুখে দাড়ি, এর বাহার বড় ভারি!'
শামা বুল্‌বুল্‌ গাহে বনে, মিলি দয়েলের সনে,
এসে চড়াই ঘরে বড়াই করে শঙ্কা নাহি মনে॥
বল শঙ্খচিল কেন যত ঘটি বাটি পাবে
আর গোদা বেটা কেন খালি ঘাড়ে লাথি খাবে?
কহ সে বা কোন পাখী যার বৌ না কহে কথা?
কিবা নামটি তার চোখে যার বড্ড হায় ব্যথা?
বটে চালাক বড় শালিক, রাখে দুনিয়ার খবর,
আর ময়না কাকাতুয়া তারা কথায় বড় জবর।
তার গলে দোলে ঝোল্লা, গায়ে কালো আলখাল্লা,
রূপের কিবা হয় জিল্লা হাই তুল্লে হাড়গিল্লা!
আছে গগনবেড়, গৃধিনী, শাঁচানি, শকুনি,
পায়রা, ঘুঘু, ফিঙ্গা, পানকৌড়ি, মাছরাঙ্গা,
কাঠঠোক্‌রা, কাদাখোঁচা, হরবোলা, হাঁড়িচাচা,
টিয়া, টুনটুনি, টিটী পাখী,—কহ কত আর বাকী।

বৈশাখ ১৩২০

শেয়াল রাজা

উপেন্দ্রকিশোর রায়

একবার শেয়ালেরা ভাবল যে, "মানুষদের কেমন রাজা আছে; শেয়ালদের কেন থাকবে না?"

"মানুষদের যে রাজা আছে, সেটা নিশ্চয় তাদের বড্ড ভাল লাগে, নইলে রাজা করবে কেন? রাজা যখন পোষাক পরে, মুকুট মাথায় দিয়ে, ঘোড়ায় চ'ড়ে, যুদ্ধ করতে যায়, তখন তা'কে দেখতে কেমন মজা লাগে! তার সঙ্গে সিপাই চলে, বাজনা বাজে,—শেয়ালদের কেন তেমন হয় না?"

সব শেয়াল বল্ল, "তাইত, কেন হয় না? চল আমরা একটা রাজা করি।"

তখন তারা ভারি খুসী হল। তাদের একটা রাজা হবে, সে পোষাক পরে, মুকুট মাথায় দিয়ে. যুদ্ধ করতে যাবে। ঘোড়ায় ত আর চড়তে, পাবে না, শেয়ালেরাই তাকে পিঠে করে নিয়ে যাবে। শেয়ালেরা সিপাই সাজবে। ঢাল তলোয়ার নাই ত কি হল—তারা খুব করে দাঁত খিঁচোবে। আর বাজনার জন্য ত কোন চিন্তাই নাই, তারা সবাই মিলে হুয়া হুয়া করবে।

রাজা তবে কে হবে?

রাজা হবে বুড়ো শেয়াল দাদা। সে সবার চেয়ে বড়, সবার চেয়ে তার বেশী বুদ্ধি, আর গলার জোর, আর ল্যাজ মোটা। যখন শেয়ালেরা যুদ্ধ করতে যাবে, তখন বুড়ো দাদা যাবে ল্যাজ খাড়া করে সকলের আগে। আর যদি পালাতে হয়, বুড়ো দাদা ল্যাজ গুটিয়ে পথ দেখাবে।

সবাই বল্লে, "বাঃ! বাঃ! বুড়ো দাদা রাজা হবে। আরে, কোথায় গেলে বুড়ো দাদা? তুমি যে রাজা হবে!"

বুড়ো দাদা বল্লে, "তা বেশ! আমি রাজা হব। তবে আমার পোষাক নিয়ে এস; রাজারা ত পোষাক পরে চলে।"

শেয়ালেরা বল্ল, 'হাঁ, হাঁ! পোষাক! পোষাক নিয়ে এস!"

তখন এক জন শেয়াল বল্ল, "পোষাক যখন ময়লা হয়ে যাবে, তাকে ধোপার বাড়ী নিয়ে যাবে কে?"

তা শুনে সব শেয়াল মাথা চুলকাতে লাগল, কেউ বল্ল না যে "আমি যাব।"

তখন অনেক ভেবে তারা ঠিক করল যে পোষাক পরলে শেয়ালকে ভারি বিশ্রী দেখাবে, আর তাতে কাজের অসুবিধাও হবে ঢের। তার চেয়ে গায় নীল রং করে নিলে বেশ হবে।

বলে তারা বুড়ো দাদার গায় বেশ করে নীল রং মাখিয়ে দিল। তাতে বুড়ো দাদা দেখতে হল ঠিক যেন শেয়ালের রাজা! তখন সবাই বল্ল "বেশ! বেশ!" কিন্তু বুড়ো দাদা বল্লে, "মুকুট কৈ? রাজারা ত মুকুট পরে থাকে!"

শেয়ালেরা বল্ল, "তাইত, রাজারা যে মুকুট পরে থাকে! শীগ্‌গির মুকুট নিয়ে তায়!"

তখন আর এক শেয়াল. বল্ল, "মুকুট যে নিয়ে আস্‌বে, শেয়ালের মাথায় সে মুকুট বস্‌বে কেন? সে ত হাওয়ায় উড়ে যাবে।"

সে কথা আর এক জন বল্ল, "তবে হাঁসুলি পরিয়ে দাও। হাঁসুলি হাওয়ায় ওড়াতে পার্‌বে না!"

এ কথাটা সকলেরই খুব পছন্দ হল। হাঁসুলি পরালে ভারি জম্‌কালো দেখাবে; এখন একটা হাঁসুলি পেলে হয়। তাতে একজন বল্ল, "হাঁসুলির ভাবনা কি? নদীর ধারে ঢের হাঁড়ি পড়ে থাকে; তার তলা উড়িয়ে দিলে খাশা হাঁসুলি হবে।"

আর একজন বল্ল, "আরে না, হাঁড়ি বড্ড ঠুন্‌কো, আর ভারি, আর তাতে খোঁচা লাগ্‌বে। তার চেয়ে কুলোর মাঝখানটা কামড়িয়ে ফেলে দিলে ভারি সরেশ হাঁসুলি হতে পারে। নদীর ধারে ঢের কুলো আছে।

অমনি তারা ছুটে গিয়ে খুব বড় দেখে একটা কুলো খুঁজে আনল। সেই কুলোর মাঝখানে ফুটো করে, হাঁসুলি বানিয়ে, বুড়ো

দাদার গলায় পরিয়ে দিতেই ত সে রাজা হয়ে গেছে, আর সবাই মিলে তাকে পিঠে করে নাচ্‌তে লেগেছে। আর তারা যে যত পারে দাঁত খিঁচোচ্ছে, আর বল্‌ছে "হুয়া, হুয়া, হুয়া! এখন আমরা যুদ্ধ কর্‌তে যাব?"

কেউ বল্ল, "কার সঙ্গে যুদ্ধ কর্‌বে?"

আর সকলে বল্ল, "বাঘের সঙ্গে!"

তারা ত জানে না যে বাঘ সেইখানেই, ঝোপের আড়ালে দাঁড়িয়ে, সব দেখছে আর শুন্‌ছে! সে তখনি বেরিয়ে এসে বল্ল, "বটে রে!"

অমনি ত সকলে "মাগো!' 'বাবাগো!' বলে, বুড়ো দাদাকে ফেলে ছুটে পালাল। বুড়ো দাদাও তার গর্ত্তে ঢুক্‌তে গিয়েছিল; ঢুক্‌তে গিয়ে তার হাঁসুলি গর্ত্তের মুখে আট্‌কে গেল, আর তার ঢোকা হল না। ততক্ষণে বাঘও এসে তাকে ধরে নিয়ে গেল।

বাঘ কি না শেয়ালের মামা হয়, তাই সে বুড়ো দাদাকে ধরে নিয়েও তাকে মারল না, খালি বেঁধে রেখে দিল। যতক্ষণ বাঘ সেখানে ছিল, বুড়ো দাদা মাথা গুঁজে বসে কাঁপছিল, একবারও মাথা তুলতে পারেনি। তার পর বাঘ যখন শিকার ধরতে বেরিয়ে গেছে, তখন বুড়ো দাদাও বাঁধন কেটে পালিয়ে এসেছে। আসতেই ত সব শেয়াল তাকে দেখে বলতে লেগেছে, "রাজা মশাই, সেলাম! রাজা মশাই, সেলাম!"

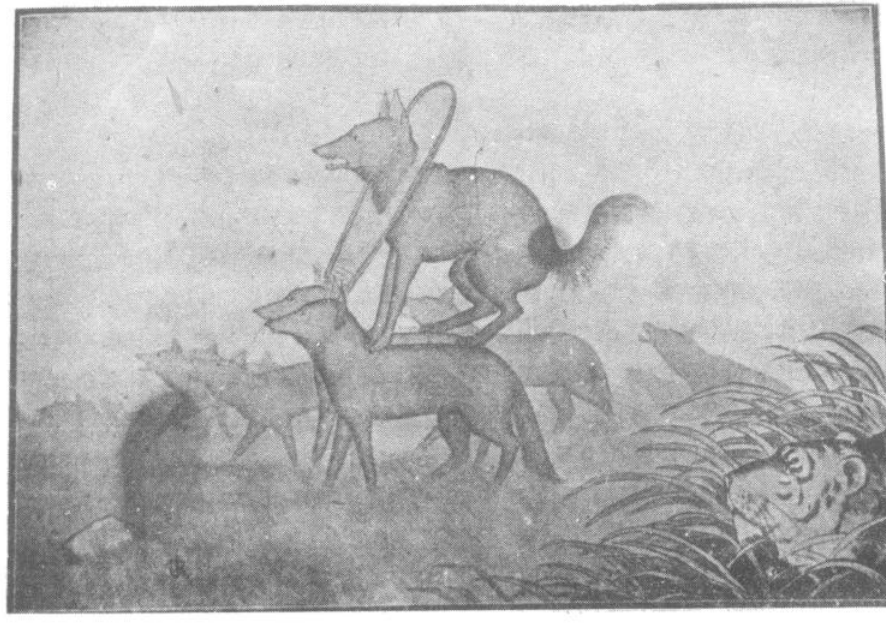

তাতে বুড়ো দাদা বল্ল, "সেলাম ভাই, সেলাম! তোমরা বেঁচে থাক; আমার আর রাজা হয়ে দরকার নেই। একবার যে হয়েছি, তাতেই আমার ঢের হয়েছে!"

কম্‌লা নাপিত

উপেন্দ্রকিশোর রায়

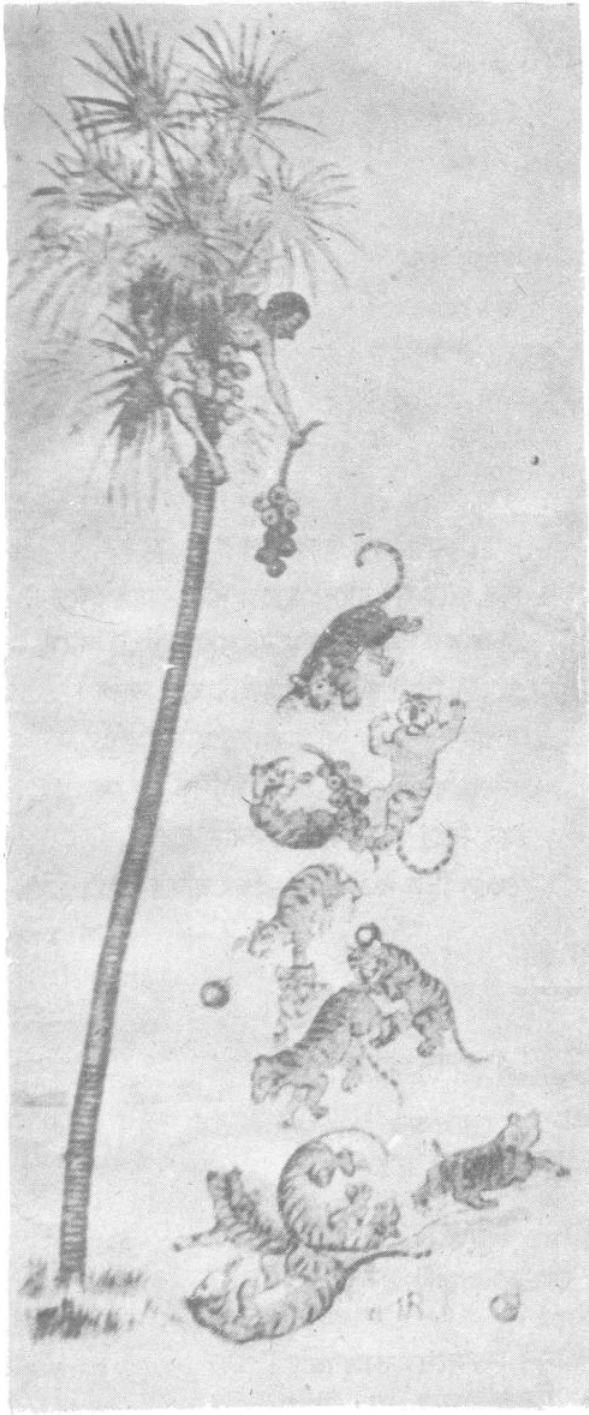

ঘোড়া চেপে কম্‌লা নাপিত যাচ্ছে তাড়াতাড়ি,
রাত না হতেই কোন মতে ফিরতে হবে বাড়ী।
বনজঙ্গল পেরিয়ে যেতেই সন্ধ্যা হলে অতীত,
বনের পাশে গাঁয়ে গিয়ে রাত্রে হল অতিথ।
রাত পোহাবার আগেই ঘরে না ফিরলেই নয়,
যেতেই হবে শেষ রাত্রে, ভাবল 'কিসের ভয় ?'
বাঘ একটা এমন সময় ঘোড়ার গন্ধ পেয়ে,
বনের থেকে এল চলে আস্তাবলে ধেয়ে।
কম্‌লা নাপিত উঠে তখন লাগাম চাবুক নিয়ে।
ঘোড়ায় চড়বে বলে হাজির আস্তাবলে গিয়ে!
বাড়ীর লোকে বলে 'কমল, রাত্রে কোথা যাবে ?
পথে আছে বনজঙ্গল, বাঘে ধরে খাবে!'
হেসে বলে কম্‌লা নাপিত, 'আমি বাঘের চাঁই,
বাঘের ঘাড়ে চড়ি আর সিংহ ধরে খাই।'
চাঁইএর কথা শুনে বাঘ বিপদ গণে মনে,
ভয়ে হয়ে জড় সড় দাঁড়াল এক কোণে।
'আয় ঘোড়া আয়', বলে কথা কয়ে মিঠে মিঠে
আঁধার ঘরে দিল সে হাত বুড়া বাঘের পিঠে!
থরহরি কাঁপে বাঘ, লাগাম নিল মুখে,
কম্‌লা নাপিত বসল তাহার পিঠে চেপে সুখে।
বাঘে চেপে যেতে যেতে পোহাল সে রাত
লাগাম মুখে বাঘটা তখন করছে হাঁৎ ফাঁৎ।
বাঘ দেখলে কম্‌লা নাপিত, নয়ক বাঘের চাঁই!
কম্‌লা নাপিত দেখলে বাঘ, ভাবে কোথা যাই!
ধরে এক গাছের ডাল লাফিয়ে উঠল গাছে,
রেগে মেগে বাঘটা তখন গেল বনের কাছে।
যেতে যেতে বল্লে বাঘ, তুই একটা ঠক্ ত।
আচ্ছা থাক! বাগে পেলেই খাবই তোর রক্ত!'

* * *

একদিন কিনা কম্‌লা নাপিত লাঙ্গল নিয়ে কাঁধে
ক্ষেতে গেছ্‌ল চাষ কর্ত্তে, আর কে লাঙ্গল ফাঁদে!

বাঘ এসে বল্লে তখন 'তুই না বাঘের চাঁই,
কোথা যাবি কমলা নাপিত! তোরে ধরে খাই।'
নাপিত বল্লে 'ওরে বাঘ! তুই যে ভারি বোকা,
ভর্ব্বে না পেট এখন খেলে দেখছিস আমি রোগা!
ধান হলে ভাত খেয়ে খেয়ে হব মোটা তাজা,
তখন বরং আমায় খেয়ে দিসরে বেটা সাজা!'
বাঘ ভাবলে ভালই কথা—'ধান হবে কবে?'
'তোমরা এসে লাঙ্গল টান, জলদি হবে তবে।'
বুড়া বাঘ বনের থেকে আর এক বাঘ এনে
চাষ করে দিল সে ক্ষেত লাঙ্গল টেনে টেনে।
তারপরে হল ধান, বাঘরা সব মিলে
ধানের বোঝা বয়ে নিয়ে ঘরে পৌঁছে দিলে।
ঘরের দুয়ার বন্ধ করে বলে নাপিত আস্তে
'ল্যাজে বেঁধে ফুটো দিয়ে দাও ত বাঘ কাস্তে।'
বুড়া বাঘ লেজ বাড়িয়ে কাস্তে যেই দিল
অম্নি নাপিত কুচ করে তার লেজটি কেটে নিল!
বেজায় রেগে বাঘের পাল বলে, 'ওরে দুষ্ট!
বাগে পেলেই করব তোকে ভাত খাইয়ে পুষ্ট!'
বলে গেল বাঘের পাল, নাপিত বলে হেসে
'আমি হচ্ছি বাঘের চাঁই, নই ক আমি যে সে'

* * *

জামালপুরের বাজার থেকে ফিরছে নাপিত একা,
ঘিরল তাকে বাঘের পালে, লাগল ভেবা চাকা!
তালের গাছ ছিল সেথা চন্দনার তীরে
উঠল নাপিত সেই গাছে, বাঘ বল্লে, 'কিরে,
গাছে উঠেই পার পাবি? একের পিঠে অন্যে
উঠে আজকে ধর্ব্ব তোরে! এসেছি সসৈন্যে।'
বাঘের উপর উঠছে বাঘ, বুড়া রইল নীচে,
নাপিত দেখলে এখন আর ভাবা চিন্তে মিছে।
ক্ষুর দিয়ে তালের কাঁদি কেটে নিয়ে ধীরে
বল্লে, 'আজ বাঘের মরণ ভরা গাঙ্গের তীরে।
ব্রহ্মা তাল, বিষ্ণু তাল আর তাল হেঁড়ে,
পড় গিয়ে সব বাঘের ঘাড়ে, নীচে আছে বেঁড়ে।'
লেজ কাটাটা ভাবল মনে, আমায় মাল্লে আগে,
অমনি কিনা বুড়া বাঘ জলদি করে ভাগে।
টপাটপ পড়ল বাঘ, মরল আছাড় খেয়ে,
বেঁড়ে পড়ল হোঁচট খেয়ে, নাপিত চল্ল ধেয়ে।
ক্ষুর দিয়ে গলা কেটে, চন্দনার জলে
ফেলে দিল যত বাঘ! জিৎ বুদ্ধির বলে!

মাঘ ১৩২০

প্রকৃতি পড়ুয়ার পাঠশালা

প্রতিমাসের প্রথম রোববার সন্দেশ কার্য্যালয়ে বিকেল চারটে থেকে ছ'টা।

[শীতকালিন]।

সন্দেশ যে পড়ে, ছয় বছরের বেশী বয়স, যে কোন ছেলে মেয়ে প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তরের সভ্য হতে পারে।

আর সব নিয়ম কানুন সন্দেশে কার্য্যালয় থেকে জেনে নাও নিজে এসে বা চিঠি লিখে।

শিশিরকুমার মজুমদারের
ধারাবাহিক উপন্যাস

থার্টিন আপ মমমমা এক্সপ্রেস

(দুপুর থেকে ঝড়জল সুরু হয়ে বিকেলে প্রচণ্ড রূপ নিল। চাকরিতে বদলি হয়ে অবনীবাবু স্ত্রী-ছেলে-মেয়েকে নিয়ে থার্টিন আপ ঝমঝমা এক্সপ্রেসে ধুমলগড় যাচ্ছেন। ছেলে সন্তু এবার মাধ্যমিক পাস করেছে, মেয়ে সুধা হায়ার সেকেণ্ডারি। মালপত্র নিয়ে সবাই যখন একটা প্রায়-খালি কামরায় উঠলেন, আকাশ ভেঙে বৃষ্টি পড়ছে। আলুথালু, নোংরা পাজামা-পাঞ্জাবী পরা উস্কো-খুস্কো চুল, সামনে বসা ছেলেটি যেন গভীর চিন্তায় মগ্ন। অবনী-বাবুরা বাঙালী জেনে সে জায়গা বদল করে দূরে গিয়ে একটা কোণে বসল। পাগল নাকি? চোর ছ্যাঁচড় নয় ত?

গাড়ি ছেড়ে দেবার পরে একজন লোক হুড়মুড়িয়ে উঠে পড়লেন—পরিচয় হতে নাম বললেন আসগর আলি। তাকে আধভেজা দেখে অবনীবাবু শুকনো জামা কাপড় দিলেন, বাথরুমে ঢুকে ছেড়ে নিলেন। সন্তু লক্ষ্য করল পাশ পকেটে কালো একটা ভারী জিনিস রাখলেন। কেমন লোক? সঙ্গে মালপত্র কিছুই নেই। এরা দুজন একই দলের ডাকাত নয়তো?

ওদের মা লুচি আলুর দম মিষ্টি বাটিতে বাটিতে ভাগ করে সকলকে দিলেন। আসগরকেও। তারপর সন্তুর হাতে ওদিকে বসা ছেলেটিকেও এক বাটি খাবার পাঠালেন। প্রথমে আপত্তি জানালেও তারপর সে গোগ্রাসে খেয়ে নিল। কি যেন এক রহস্য আছে। সন্তুর মনে হ'ল যে সে বসে কাঁদছিল। কোথা থেকে আসছে জিজ্ঞাসা করাতে চমকে উঠল।

সুরাইয়া নদীর ব্রিজ পার হয়ে ট্রেন চলল। এর পরে পাপান নদী পার হয়ে মাঝাণ্ডি, সেখানে বড় মিলিটারি বেস আছে। গাড়ি খুব লেট চলছে। সামনের জানলা একটু খুলে অবনীবাবু দেখলেন চারিদিকে জল আর জল—রেল লাইন ছুঁই ছুঁই! আতংকভরা মুখে উনি বসে পড়লেন।)

ট্রেনের গতি কমতে কমতে এক সময়ে গাড়ি থেমেই গেল। ইনজিন থেকে বারবার হুইস্‌ল্‌ বাজছে। সামনে নাকি লাইন ভেঙে গেছে! ব্রীজ জলের তলায়। গার্ড নেমে এসে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলছেন। আসগর গিয়ে নিজের কার্ড গার্ডকে দেখালেন—তাতে লেখা 'অরুণ রায়, ইনসপেক্টার জেনেরাল অফ পোলিস,' কিন্তু এখন তাঁকে আসগর আলি বলতে হবে। পরামর্শ করে স্থির করা হল যে পাপান নদীর ব্রীজের কাছ থেকে গাড়ি পিছিয়ে ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে নিতে হবে। সেখানে এসে গাড়ি থেমে গেল। দেখা গেল যে আলো নিভে গেছে। সিগন্যাল ডেড! গার্ড আর আসগর আলি হেঁটে আরো পিছিয়ে আগের স্টেশন সুরাইয়ার দিকে চললেন। সর্বনাশ! স্টেশন অন্ধকার। ফোনও চলছে না। সুরাইয়া নদীর ব্রীজ জলের তলায়। রেলের কোয়ার্টার্স ভেসে গেছে তাই সবাই এসে স্টেশনে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু স্টেশনও ডুবে যেতে পারে।

এ-লাইনের মধ্যে সব চেয়ে উঁচু জায়গা হল ডিসট্যাণ্ট সিগন্যালের কাছে, যেখানে ট্রেনটা দাঁড়িয়ে আছে। স্টেশনের সবাইকে সেখানেই যেতে হবে, মালপত্র নিয়ে সকলে এগোল। স্টেশনমাস্টারের প্রায় নব্বই বছরের মাও লাঠি হাতে এগিয়ে চললেন।

ট্রেনের সেই কোণে-বসা লোকটিকে দেখা গেল হেঁটে উল্টো দিকে চলতে। যাবার পথ নেই জেনে সে খুব হতাশ হয়ে ফিরে সবার সঙ্গেই চলল।

বুড়িমা পিছিয়ে পড়ছেন, বললেন 'তোমরা এগিয়ে যাও।' সেই লোকটি প্রায় জোর করেই তাঁকে পিঠে তুলে নিল। বিড় বিড় করে সে বলছিল যে পাপ সে করেনি তার বোঝা বয়ে তাকে এখন পালিয়ে বেড়াতে হচ্ছে।

বুড়িমা আবার বললেন 'তোমরা সবাই এগিয়ে যাও—আমরা ধীরে ধীরে আসছি।' অগত্যা তাই সকলে এগিয়ে গেলেন।

আতঙ্কিত যাত্রীরা সবাই আবার কামরায় উঠে বসল। বৃষ্টি কখন থামবে, সাহায্য কখন আসবে, কিছুই ঠিক নেই। স্থির হল যে লোক গুনে সব কামরার ভাগ করে রাখতে হবে। যার কাছে যা খাবার আছে সব রেস্টুরান্ট কারে জমা রাখতে হবে। খাবার আর জল কড়াভাবে র‍্যাশন কর দরকার। বাচ্চাদের আর বৃদ্ধবৃদ্ধাদের কথা আগে ভাবা হবে। সব পাখা বন্ধ করে দিতে হবে। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া বাতি জ্বালাও চলবে না। সব কামরায় ঘুরে ঘুরে গার্ডসাহেব, মাস্টারবাবু আর আসগর আলি সবাইকে নির্দেশ দিতে লাগলেন। এয়ার কণ্ডিশনড্ কোচ আর ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রীরা প্রথমে খুব চেঁচামেচি করলেন গার্ডের নামে কমপ্লেন করবেন বললেন। শেষে সব ব্যবস্থা মেনে নিতে বাধ্য হলেন।

ভলানটিয়ারের দল গড়ে সব সময় লাইন পাহারা দিতে হবে শুনেই সন্তু এগিয়ে এল। তার বারো বছর বয়স, ভাল সাঁতারু। আর একটি হিন্দুস্থানী ছেলে এল, নাম হনুমান প্রসাদ। তার বাবা কারখানার দারোয়ান, সেও কাজে নামল।

আর একটা জরুরী কাজ হল সারাক্ষণ রেডিও খুলে রাখা। যাদের কাছে ট্রানজিস্টর রেডিও আছে, সকলকে বলা যেন কখন কি খবর বলে সব খেয়াল রাখে।

সেই লোকটা সামনে এসে বলল 'আমি ভাল সাঁতার জানি। আমাকে কাজ দিন।'

আসগর আলি লক্ষ্য করে দেখলেন। নিঃসন্দেহে এই সেই রাজেন চন্দ্র। খুনি বলে যার নাম কাগজে বেরিয়েছে। বিলেত ফেরত ইনজিনিয়ার। সত্যি কি ও খুন করেছে?

দূরে দেখা গেল জলের মধ্যে একটা গাছে অনেক লোক ঝুলছে। ছেলে, মেয়ে, বাচ্চা। লোকটি দড়ি ধরে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সাঁতরে গিয়ে, গাছের সঙ্গে দড়িটা বেঁধে, একে একে অনেককে উদ্ধার করল।

জলের মধ্যে কয়েকটা গাছে আরো লোক ঝুলে আছে। সাঁতারু চাই আরো। অনেকে এগিয়ে এল। নামী সাঁতারু 'শাশা' বাবার নিষেধ না শুনে এসে দলে যোগ দিল।

ওদিকে পাঁচ ছয় জন সাহেবী পোষাক পরা ফার্স্ট ক্লাসের যাত্রী চেঁচামেচি লাগিয়েছেন। ওঁদের জল ফুরিয়ে গেছে। খাবার কিনতে পারেন নি, ওঁরা কমপ্লেন করবেন। স্টেশনে পৌঁছবার আগে অবশ্য পারবেন না।

হঠাৎ খবর এল যে রেডিওতে এই আটকা পড়া ট্রেনের কথা বলেছে!

রেডিওর খবরে শোনা গেল যে মাঝাণ্ডি বেস্ ক্যাম্প থেকে উদ্ধারের কাজ শুরু হচ্ছে।

এদিকে সামনে, মাইল খানেক আগে লাইন ধ্বসে গেছে। সেখান দিয়ে তোড়ে জল বেরোচ্ছে। সেই জলে অনেক জিনিস আর মানুষ ভেসে আসছে।

ভাল সাঁতারু বেছে নিয়ে সেই সব ভেসে আসা মানুষদের উদ্ধার করবার জন্য টিম তৈরি করা হল।

শাশার বাবা মিঃ চক্রবর্তী প্রথমে রাগারাগি করেছিলেন। তারপর মেয়ের কাজ দেখে উৎসাহিত হয়ে নিজেই এগিয়ে এসে উদ্ধারের কাজ পরিচালনার দায়িত্ব নিলেন।

হঠাৎ মেঘের পেছন থেকে একটা প্লেনের শব্দ শোনা গেল—কিন্তু কিছু দেখা গেল না। জামা কাপড় কাগজের বোঝা লাইনের ওপর রেখে আগুন লাগানো হল। ধোঁয়ায় চার দিক ভরে গেল।)

॥ ৬ ॥

সে ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে আকাশেও উঠতে লাগল।

সঙ্গে সঙ্গে শব্দটা খুব কাছে এসে পড়ল। আনন্দে সবাই চেঁচিয়ে উঠল। 'প্লেন, প্লেন! ওই ওটা গোঁত্তা মারল আমাদের দিকে।' গোঁত্তা খেয়ে প্লেনটা বহু নীচে নেমে এল। ছেঁড়া মেঘের ফাঁকে ওকে বেশ স্পষ্ট দেখা গেল। ধোঁয়া বরাবর এসে প্লেন থেকে কি যেন ফেলা হল। একটা বাণ্ডিলের মত কিছু। হু হু করে সেটা নীচে নামতে নামতে প্যারাসুটটা খুলে গেল। হাওয়ায় হেলতে দুলতে জিনিসটা নীচে নামতে লাগল। আবার ঘুরে এল প্লেনটা। আবারও তেমনি একটা কিছু নীচে ফেলল। বার বার চার বার ঘুরে এসে ও জিনিস নামিয়ে দিয়ে উড়ে চলে গেল মাঝাণ্ডির দিকে।

মিস্টার চক্রবর্তী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'গেট রেডি বয়েজ। গেট রেডি। আগে ওই মাল গুলো উদ্ধার করতে হবে, পরে অন্য কাজ। এই যে মশাই লাফান, লাফান, এক নম্বর প্যারাসুটটার দিকে যাবেন আপনি। মাল জলেই পড়বে। দ্বিতীয় দল রেডি, ওটাও জলে পড়বে; শাশা দ্বিতীয়টার ভার তোমার। তৃতীয়টা লাইনে পড়বে বলে মনে হচ্ছে। সাঁতারুরা বাদে অন্যরা দৌড়াও। ওটা তারা বয়ে আনবে। চার নম্বরটা আমাদের নাগালের বাইরে, অতদূরে আমি কাউকে সাঁতারে যেতে দেব না, তা ওতে যাই থাক না কেন।

লোকটা ততক্ষণে প্রথম মালটা ধরে ফেলেছে। এমন ভাবে প্যাক করা মাল যে জলে ভাসছিল। অল্প চেষ্টাতেই প্যারাসুটটা খুলে ফেলে মালটা টেনে ও পাড়ে এনে ফেলল। সঙ্গে সঙ্গে অন্যরা ওটা টেনে তুলে নিল উপরে।

শাশাও অন্য পাশেই দ্বিতীয়টা টেনে আনল পাড়ে। তৃতীয়টাও বয়ে নিয়ে ফিরল অন্যরা। একজন ছুরি বার করল পকেট থেকে। তা দেখে মিস্টার চক্রবর্তী ধমকে উঠলেন, 'না, মাল এখানে খোলা হবে না, মাল বয়ে নিয়ে গার্ড সাহেবের গাড়িতে তোল আগে। তারপর আপনি দাঁড়িয়ে থেকে এক এক করে মাল খোলাবেন। সাঁতারুরা কেউ জায়গা ছেড়ে নড়বে না। অন্যরা যাক সাহায্য করতে।'

মাল তুলে নিয়ে গেলেন আসগর আলি। ভারী বোঝা অনেক কিছু যে ওতে আছে তাতে সন্দেহ নেই।

প্রথম প্যাকেট থেকে বার হল শুকনো খাবার অনেক। কিছু পেটের গোলমালের ওষুধ। আর একটা ছাপান নোট। তাতে লেখা, জায়গা খুঁজে পেলেই স্পিড বোট নিয়ে জোয়ানরা আসবে সবাইকে উদ্ধার করতে। কেউ যেন গাড়ির কাছ ছেড়ে না যায়।

দ্বিতীয় প্যাকেটেও প্রথম প্যাকেটের মতই শুকনো খাবার। গুঁড়ো দুধ বাচ্চাদের জন্য। আরও কিছু ওষুধ। তৃতীয় প্যাকেটটাতে খাবারের সঙ্গে একটা ওয়াকি টকি, আর কিভাবে ওটা ব্যবহার করতে হবে তার নির্দেশ। আসগর আলি জিনিসটা হাতে তুলে নিয়ে চালিয়ে ডাকলেন, 'হ্যালো, হ্যালো, থারটিন আপ ঝমঝমা এক্সপ্রেস থেকে বলছি। আমরা জলবন্দী। একশ কিলোমিটার মাইলপোস্টের কাছে দাঁড়িয়ে আছি। হ্যালো, হ্যালো।'

সঙ্গে সঙ্গে ওদিক থেকে উত্তর এল। 'হ্যালো, ভয় পাবেন না, প্লেন আপনাদের খবর দিয়েছে। স্পিড বোট এখুনি রওনা দিচ্ছে। লোকসংখ্যা কত বলতে পারেন কি?'

'তিনশ। মহিলা শিশু সব নিয়ে।'

'এক একটা স্পিড বোটে স্বচ্ছন্দে পনেরো জন বসতে পারবে। দশটা স্পিড বোট প্রথম ক্ষেপে যাচ্ছে। আগে শিশু বৃদ্ধ ও মহিলাদের পাঠাবেন। পরে অন্যরা, বুঝলেন?'

'হ্যাঁ বুঝেছি, আমরা কতক্ষণ বাদে স্পিড বোটগুলোকে আশা করতে পারি?'

'এক থেকে দেড় ঘণ্টার মধ্যে আশা করতে পারেন। মাঝাণ্ডি মিলিটারি বেস থেকে ওগুলো রওনা হচ্ছে। আপনি কে বলছেন, জানতে পারি কি?'

'আমি অরুন রায়, এস, পি, বেটলা আপাতত ছুটিতে আছি।'

'ধন্যবাদ। যোগাযোগ রাখবেন। চিন্তা করবেন না।'

'আমার কিন্তু আরও কিছু বলার ছিল।'

'বলুন।'

'জল নামতে আরম্ভ করেছে, জলের টান পাপান নদীর দিকে। বানভাসি হয়ে আসছে মানুষ জন। কিছুকে আমরাই উদ্ধার করেছি। অন্যদের উদ্ধারের জন্য ব্যবস্থা করুন। জলের টানে ভেসে আসছে তারা।'

'সর্বনাশ। তাহলে আটটা বোটে যাত্রী পাঠাবেন। দুটো বোট রেখে দেবেন বান-ভাসিদের উদ্ধারের জন্য। আমরা স্পীড বোট ড্রাইভারদের তেমনই হুকুম দিচ্ছি।'

আসগর আলি বললেন, 'ধন্যবাদ। বোট তাড়াতাড়ি পাঠান।'

চারিদিকে দেখতে দেখতে খবর রটে গেল বোট আসছে, বোট আসছে।

জোয়ান কজন ছোকরাদের বলে দিলেন আসগর আলি, তারা যেন দেখে গাড়ি থেকে কেউ না নামে। বোট এলে হিসাব মত একে একে সবাই যাবে। সবাই মেনে নিল ওর কথা। তারপর সুরু হল খাবার বিলি। ক্যান্টিন ম্যানেজার তাঁর লোকজন সমেত এসে তার পুরো দায়িত্ব নিলেন। নিশ্চিন্ত মনে গার্ডের কামরা থেকে নেমে পড়লেন আসগর আলি। আবার চললেন সাঁতারুর দলের কাছে।

এর মধ্যে তিনজনকে পারে তোলা হয়েছে। তাদের একটা কামরার লোকরা নিয়ে গেছে ভিতরে।

জলের টান বেড়েছে ভীষণ। কলকল আওয়াজও ক্রমে ভীষণ বেড়ে উঠেছে। বাড়ীর ভাঙ্গা চাল, খাট, চৌকি, মরা গরু, কুকুর, এমন কি দুজন মরা মানুষও ভেসে গেল সামনে দিয়ে। একটা ভাঙ্গা চালার উপরে একটা কুকুর অসহায় ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল। ওদের দেখে ওর সেকি কান্না। সেই লোকটা জলে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছিল, তার জায়গা থেকেই চেঁচিয়ে মিস্টার চক্রবর্তী ধমকে উঠলেন, 'সেন্টিমেন্ট মুছে ফেল মন থেকে। ওর জন্য যে এনার্জী খরচ করবে সেটা মানুষের জন্য সঞ্চয় রাখ।'

লোকটা থমকে গেল। তখনি ইনজিনের পাশের গাড়ির মাথা থেকে টর্চের আলো দেখা গেল। বারবার জ্বলছে নিভছে!

মিস্টার চক্রবর্তী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'প্রথম দল রেডী। বলা মাত্র জলে নামবে। বিরাট কিছু আসছে। যান আপনি, দ্বিতীয় দলকেও তৈরী হতে বলুন।' বলে উনি তাকালেন আসগর আলির দিকে। ছুটে আসগর আলি দ্বিতীয় দলের সামনে এসে বললেন, 'রেডী হও সবাই, রেডী হও। গাড়ির মাথায় বার বার আলো জ্বলছে। তার মানে, বিরাট কিছু আসছে ভেসে।'

সাঁতারুরা সবাই উঠে দাঁড়াল। আসগর আলি দেখলেন প্রথম দল জলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। উনি চেঁচিয়ে উঠলেন, 'দ্বিতীয় তোমরাও জলে নামার জন্য তৈরী হও।' একথা বলেই উনি মুখ তুলে তাকিয়ে দেখে থমকে গেলেন। দুটো চালা ভেসে আসছে পরপর। দুটোর উপরেই আলাদা আলাদা মানুষ বসে আছে কজন। স্রোতের টানে চালা দুটো একটা অপরটার গায়ে ধাক্কা মারছে। পাক খেয়ে ঘুরে যাচ্ছে এপাশ থেকে ওপাশে। একটা ধরলেই অন্য চালাটা স্রোতের টানে ঘুরে জাঁতা কলে পেষার মত পিষে মারবে, যে ধরবে তাকে।

মিস্টার চক্রবর্তী চেঁচিয়ে উঠলেন, 'ছেড়ে দে শাশা, ছেড়ে দে প্রথমটাকে। সরে যা পাশে, বাঁ পাশে। পারলে দ্বিতীয়টা ধরবি। না পারিস তো দুটোই ছেড়ে দে। খবরদার।'

কি যে হল বুঝতে পারলেন না আসগর আলি। পিছনের চালাটা হঠাৎ ভীষণ ভাবে ঘুরে এল সামনের দিকে। জলের মধ্যে আওয়াজ উঠল মড়মড় মড়মড়। আতঙ্কে

চেঁচিয়ে উঠলেন মিস্টার চক্রবর্ত্তী, 'শাশা, শাশা, ছেড়েদে, তোর বন্ধুকেও বল সরে আসতে। দোহাই তোদের।' ওঁর কথার শেষে আবার জায়গা বদল করল ভাসন্ত চালা দুটো। আবারও আওয়াজ উঠল মড়মড় মড়মড়।

'শাশা,' বলে বুক ফাটা আর্তনাদ করে মিস্টার চক্রবর্ত্তী দুহাতে মুখ ঢেকে মাটিতে বসে পড়লেন।

তাকিয়ে দেখলেন আসগর আলি, সেই লোকটা তাঁর পাশে নেই, নেই খোদাবক্স, অপূর্ব আর রামপিরিত। ওরা ওঁর কথা না শুনেই জলে ঝাঁপিয়ে পড়েছে, দুটো ভাসন্ত চালার মাঝ থেকে শাশাকে তুলে আনতে। ওদিকে চিৎকার উঠল, 'কিছু হয়নি। ওইতো বহিনজী একটা চালায় উঠে পড়েছে।'

'কিন্তু ওই বাবু, ওই বাবু কোথায়?' কে যেন আতঙ্কে জিজ্ঞাসা করল।

'ওই তো, ওই তো উনি ওখানে। দুটো চালাকে আলাদা করার চেষ্টা করছেন। দেখছেন না প্রথম চালার সবাই এখন দ্বিতীয় চালাটায় উঠে পড়েছে।'

'বাপরে, কি বুকের পাটা লোকটার', একজন বলল। 'একাই সবাইকে টেনে তুলল পিছনের চালাটাতে!'

'না না, অন্যরাও তো ওকে ভীষণভাবে সাহায্য করেছে।'

'সাবাস বাবুজী। সাবাস।'

সেদিকে তাকিয়ে দেখলেন আসগর আলি, সামনের চালাটা যেন একটু আলগা হয়ে পড়েছে। তার উপরে আর কেউ নেই। পিছনের চালাটা ভারে প্রায় ডুবু ডুবু। সেটাকেই টেনে পাড়ের দিকে আনতে চেষ্টা করছে সব সাঁতারু। হাঁপিয়ে পড়েছে সবাই। বিশেষ ওই লোকটা। ওই এতক্ষণ এভাবে সবাইকে এক চালাতে তুলেছে নিজের প্রাণের মায়া না করে। সব পাপেরই তো প্রায়শ্চিত্ত আছে। ও কি তা এখনও করেনি? একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলেন আসগর আলি। হঠাৎ পাড়ের সবাই আতঙ্কে চিৎকার করে উঠল, 'গিয়া গিয়া ওঃ বাবুজী···' কথা ওদের আর শেষ হল না।

সামনের হাল্কা চালাটা হঠাৎ একটা মোচড় মেরে এসে পড়ল পিছনের চালাটার গায়ে। মড়মড় করে আবার বিশ্রী কতকগুলো আওয়াজ উঠল। সেই সঙ্গে যন্ত্রণায় কাতর একটা চাপা আর্তনাদ ঢেউয়ের বুকে হারিয়ে গেল। জলের বুকে ছিটকে উঠল একটা দেহ। হাড় পাঁজরা গুঁড়িয়ে গেছে তার। উপুড় হয়ে পড়ল দেহটা জলে। ঘন কাদাগোলা গভীর জল লালে লাল হয়ে গেল। ঢেউয়ের তালে ভাসতে ভাসতে দেহটা চলে গেল অনেক দূরে! কাঁপতে কাঁপতে মাটিতে বসে পড়লেন আসগর আলি। প্রায়শ্চিত্ত তো এমন করে ওকে করতে বলেন নি আসগর আলি। একি হয়ে গেল! কারও মুখে কোন কথা নেই। চালাটা পাড়ে টেনে ধরল সবাই। এক এক করে সবাই নামল।

কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল শাশা, 'আমার জন্য বাবা, আমার জন্য···।' মেয়েকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলেন মিস্টার চক্রবর্তী। তাঁর মুখেও কথা নেই।

লোহারু বলল, 'নেহি বহিনজী আমি ভুল করলাম, আমি ওকে টেনে তুলতে পারতাম, পারলাম না।'

খোদাবক্স বলল, 'ওহি কসুর তো মেরা ভি।'

অপূর্ব বলল, 'কেউই আমরা কিছু করতে পারতাম না ভাই; ও আমাদের মনের ভুল। তলে গাছ থাকাতে সামনের চালাটা বাধা পেয়ে অমন আচমকা ঘুরে গিয়েছে। অথচ আমাদের ভারী চালাটা কিন্তু ডোবা গাছটা পার হয়ে বেশ চলে এল।'

শাশা বলল, 'তা হলেও উনি আমাকে বাঁচাবেন বলেই না অমন ভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আমাকে লোহারুকে তুলে দিয়ে আর উনি নিজেই উঠতে পারলেন না। দুটো চালার মাঝে পড়ে পিষে গেলেন।'

মিস্টার চক্রবর্তী বললেন, 'তুমি ভাবছ তাই। কিন্তু জান, ওতো জেনে বুঝেই ঝাঁপ দিয়ে ছিল জলে। আমি তো ভেবেছিলাম তুমি আর ওই ছেলেটাই পড়বে জাঁতা কলে। কি জানি কেন যে ও জেনে বুঝে অমন করল।'

শাশা আবারও বলল, 'সে তো বাবা আমাদের বাঁচাবে বলেই।'

কাঁপা গলায় আসগর আলি বললেন, 'এসব কথা থাক এখন। তোমরা সবাই তো প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে উদ্ধারে লেগেছিলে। এ্যাক্সিডেন্টতো যার হোক হতে পারত। ওর হয়েছে, তার জন্য আমরা দুঃখিত। ও বীরের মত মরেছে। আমরা ভাবিনি ওর এমন হবে। কিন্তু কিছুই করার আর উপায় ছিল না।'

মিস্টার চক্রবর্তী বললেন, 'একথা ঠিক। সবাই তোমরা বস। বসে বিশ্রাম কর। আবার জলে নামতে হতে পারে সে খেয়াল আছে তোমাদের? সামনে আরও কত বিপদে যে অপেক্ষা করছে কে জানে। প্রস্তুত থাক তার জন্য।'

আসগর আলি আবার কিছু বলতে যাচ্ছিলেন। তখনি জলের ওপর দিয়ে দূর থেকে অদ্ভুত সব শব্দ ভেসে এলো। সবাই উঠে দাঁড়াল সে শব্দ শুনে। কিছুক্ষণ কান পেতে শুনে কে যেন বলল, 'বোট আসছে, মোটর বোট।'

আসগর আলি সঙ্গে সঙ্গে ওয়াকি টকি চালিয়ে দিলেন। শুনতে পেলেন, 'হ্যালো, হ্যালো হ্যালো, স্পিড বোট নিয়ে আমরা আসছি। সামনে ঘন কুয়াশায় দিক বুঝিতে পারছি না। আপনার যে করে হোক দিক জানান দিন। হ্যালো, তাতে কাজ সহজ হবে।'

আসগর আলি বললেন, 'আমরা চেষ্টা করছি আগুন জ্বালিয়ে। ইনজিনের হুইসিলও বাজাচ্ছি ঘনঘন। আপনারা খেয়াল রাখুন।'

উত্তর হল, 'তাই করুন জলদি।'

আবার আগুন জ্বালান হল। ড্রাইভার ঘন ঘন হুইসিল বাজাতে থাকলেন। এক সময় মনে হল ওই শব্দ শুনে যেন দিক খুঁজে পেয়ে তাদের দিকেই তেড়ে আসছে মোটর বোটগুলো।

ট্রেনের সব কম্পার্টমেন্টের দরজাগুলো খুলে গেল। সব যাত্রীরাই দরজা জানালা দিয়ে ঝুঁকে পড়লেন।

মিস্টার চক্রবর্তী বললেন, 'সবাই নেমে দৌড়াতে আরম্ভ করলে তো বিপদ ঘটবে। সবাইকে নামাতে বারণ করতে হবে। ছেলে ছোকরারা দৌড়াও। বল সবাইকে গাড়ির ভিতরেই থাকতে।'

একদল সঙ্গে সঙ্গে দৌড়াল ট্রেনের কামরা গুলোর দিকে। চেঁচাতে লাগল তারা, 'নামবেন না, নামবেন না, আপনারা কেউ নামবেন না।'

কেউ নামল না গাড়ি থেকে। শুধু উঁচু ক্লাসের যাত্রীরাই তাদের লটবহর টেনে এনে নিচে নামতে লাগল।

একজন ছেলে বলল, 'আপনারা নামবেন না। অমনি করে। আপনাদের দেখা দেখি সবাই নামলে তো বিপদ হবে। আপনারা উঠে যান গাড়িতে।'

একজন সুট বুট পরা ধমকে উঠল, 'তুমি কেহে এসব কথা বলার? যখন তিন চারগুণ ভাড়া গুনে দিয়েছিলাম তখন ছিলে কোথায়? মাতব্বরি করতে হয় তো ওদিকে যাও। বোট এলে আমরা আগে যাব, সবার আগে।'

ছেলেটা ভয় পেয়ে পিছিয়ে এল।

কিছুক্ষণ পরেই দূরের কুয়াশা ভেদ করে জলের উপরে সার সার বোট দেখা গেল। তার একটা সামনে এসে ভিড়ল আগে। তার থেকে নামলেন একজন মিলিটারি অফিসার। অল্প বয়স তাঁর। সুন্দর দেখতে, হেসে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'আমি লেফটেনেন্ট জহর ইকবাল। আমি এই রেসকিউ অপারেশনের চার্জে। কে আপনাদের মধ্যে অরুণ রায়, ইন্সপেক্টর জেনারেল পুলিশ, বেটলা?'

আসগর আলি হাত বার করে এগিয়ে এলেন। বললেন, 'ট্রেনের চার্জে আছেন গার্ড সুনীল ভার্গব।'

বোট দেখে গার্ড সাহেবও নেমে এসে ছিলেন। তিনিও হাত মেলালেন।

লেফটনান্ট ইকবাল বললেন, 'এখন আপনারা বিশ্রাম করতে পারেন। সব দায়িত্ব আমরা নিচ্ছি। কারও অসুখ হয়েছে? এ্যাক্সিডেন্ট? সঙ্গে ডাক্তার আছেন। বাচ্চাদের জন্য তৈরি দুধও এনেছি আমরা। মায়েরা বাচ্চারাই আগে যাবেন।'

গার্ড সাহেব বললেন, 'আমরা তাহলে সামনের ওই কম্পার্টমেন্টে অপেক্ষা করছি। প্রয়োজনে ডাকবেন।'

লেফটনান্ট ইকবাল বললেন, 'নিশ্চয়ই। কিন্তু এরা কারা?'

উঁচু ক্লাসের যাত্রীরা তাদের মালপত্র টেনে এনে হাজির হয়েছেন সবাই। একজন বলল, 'আমাদের আগে তুলে নিতে হবে লেফটনান্ট। আমরা ছোটলোকদের সঙ্গে একসঙ্গে যাব না। মনে রাখবেন, আমরা চারগুণ টাকা দিয়েছি টিকিটের জন্য।'

লেফটনান্ট বললেন, 'মহিলারা বাদে আপনারা পিছিয়ে আপনাদের গাড়িতে গিয়ে বসুন। সময় মত আমি ডাকব।'

মিস্টার চক্রবর্তী এগিয়ে এসে বললেন, 'সবার আগে লেফটনান্ট আপনাকে অন্য একটা ব্যবস্থা করতে হবে। তা হল বানভাসিদের তোলার ব্যবস্থা করা। জলের টানে অনেকেই ভেসে আসছে।'

আসগর আলি বললেন, 'হ্যাঁ, এঁর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই লেফটনান্ট, ইনি মিস্টার চক্রবর্তী ইনি,এঁর মেয়ে আর আমাদের সাঁতারুর দল ওঁর নেতৃত্বে দারুণ কাজ করেছে। বহু বানভাসিদের এরা জল থেকে উদ্ধার করেছেন। আপনি ওদিকেই সবার আগে নজর দিন।'

সঙ্গে সঙ্গে লেফটনান্ট তাঁর হাতের ওয়াকি টকিতে কি যেন সব নির্দেশ দিলেন। দু পাশের দুটো বোট সঙ্গে সঙ্গে দল ছেড়ে ভেসে পড়ল ফের জলে। ওরাই বানভাসিদের উদ্ধার করবে।

লেফটনান্ট বললেন, 'মিস্টার চক্রবর্তী আপনার দলবল নিয়ে আপনিও বিশ্রাম করতে যান। এখন এখানকার সব দায়িত্ব আমার উপরে ছেড়ে দিন। আমরাই সব কিছু করব।'

ধন্যবাদ জানিয়ে সবাই এসে উঠলেন সেই কম্পার্টমেন্টে, যেখানে সেই বৃদ্ধ ভদ্রলোক তাঁর ট্রান্‌জিস্টার রেডিও খুলে তখনও বসে আছেন।

গার্ড সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমাদের খবর কি আর কিছু শুনেছেন আপনি?'

সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন বৃদ্ধ। বললেন, 'তিন চারবার আমাদের খবর অন্য প্রোগ্রামের মাঝে বলেছে। মাঝাণ্ডির মিলিটারি বেসের সঙ্গে আমাদের যে যোগাযোগ হয়েছে, সে খবরও ওরা দিয়েছেন। বলেছেন, উদ্ধার কাজ তাড়াতাড়ি সুরু হবে। এখন আর পনের মিনিট পরে নিউজে কি বলে শুনুন। তারপর তো আর খবর শোনার দরকার হবে না।'

আসগর আলি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ আমাদের সব উৎকণ্ঠা দুশ্চিন্তার শেষ হয়েছে। আপনার ডিউটি থেকেও আপনি মুক্ত হলেন। বাকি থাকল সেই সব ছেলেগুলো। যারা লাইনের দুদিকে বানের জল দেখে বৈড়াচ্ছে। কিছু পরে গিয়ে আমি তাদের ডেকে আনব।'

তা আর ওঁকে করতে হল না। দল বেঁধে হল্লা করে ওরা ফিরে এল সবাই। লেফটনান্ট সাহেব ওদের ছুটি দিয়েছেন। ওদের কাজ করছে জোয়ানরা।

সন্তু, এগিয়ে এসে বলল, 'আপনি আসগর আলি নন?'

হেসে আসগর আলি বললেন, 'কে বলল তোমাকে একথা?'

'সবাই বলেছে, আপনি বড় পুলিশ অফিসার। আমি কিন্তু সন্দেহ করেছিলাম আপনার পকেটে পিস্তল দেখে।'

'তুমি তো আমাকে ডাকাত ভেবেছিলে।' হেসে বললেন আসগর আলি।

'বাঃ, তাছাড়া আর কি ভাবব?' বলল সন্তু, 'কিন্তু সেই আসল ডাকাত কোথায়? তাকে তো দেখছি না?'

শাশা এক পাশে চুপ করে মনমরা হয়ে বসেছিল, জিজ্ঞাসা করল, 'তুমি কার কথা বলছ?'

অসহায়ের মত সন্তু এদিক ওদিক তাকিয়ে বলল, 'ওই যে তার কথা, যে কোণায় একা বসে বসে কাঁদছিল। তাকেও আমার ভীষণ সন্দেহ হয়েছিল।'

লোহারু অবাক হয়ে বলল, 'উও কৌন থে? ওরতো কোনও খবর আমাদের জানা নাই ভাই।'

ভীষণ বিব্রত হয়ে সন্তু বলল, 'না, না,

তোমরা তাকে চিনবে কি করে, আলি চাচা, তাকে দেখলেই ভীষণ সন্দেহ হয়।'

'হ্যাঁ' দীর্ঘ শ্বাস ফেলে আসগর আলি বললেন, 'তোমরা সবাই তাকে চেন। এই কিছুক্ষণ আগে যে নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে অন্যদের বাঁচাল, তার কথাই বলছে আমার এই ছোট্ট বন্ধু। সে নেই, সে বানের জলে হারিয়ে গেছে।'

থমকে গেল সন্তু। অন্যকে বাঁচাতে গিয়ে মারা গেছে! তবে কি ও—!

ওদিকের ট্রানজিস্টার রেডিওতে তখনি খবর বলা শুরু হল। সবাই চুপ করে তাই শুনতে থাকল। দেশের রাজনৈতিক খবরের পর নানান দেশের খবর হ'ল। তারপর দেশের বিশেষ বিশেষ খবরের মধ্যে থারটিন আপ ঝমঝমা এক্সপ্রেসের খবর বেশ বিস্তারিত ভাবেই বলল। সব শেষে বলল, নারাঙ্গীয়া হাইড্রো ইলেকট্রিক প্রজেক্টের সেই, রহস্যময় খুনের কিনারা এতদিনে হয়েছে। এ্যাসিট্যান্ট ইনজিনিয়ার রবিকুমারের খুনের জন্য দায়ী তার আর্দালী, চরণ সিংকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। জুয়া খেলায় অনেক টাকা খুইয়ে সে রবি কুমারের টাকা চুরি করে। ধরাও পড়ে। রবিকুমার তাকে বলে টাকা শোধ না করলে অফিসে রিপোর্ট করবে তাতে তার চাকরী যাবে বলে ভয় দেখায়। রবিকুমারের ইমিডিয়েট বস, রাজেন চন্দ্রের সঙ্গে এর মধ্যে একদিন তার অফিসেই সবার সামনে বেশ কথা কাটাকাটি হয়। রাজেন বাবু রবিকে প্রচণ্ড ধমক দেন তার কিছু কাজের গাফিলতির জন্য। রবি কুমার তাতে ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েন। এই ঝগড়ার সুযোগ নেয় চরণ সিং। সে নির্জনে রবিকুমারকে পিটিয়ে হত্যা করে। হত্যার অস্ত্র লোহার রডখানা রেখে আসে রাজেন চন্দ্রের তাঁবুতে। রাজেন চন্দ্রের একটা রুমাল এনে ফেলে রাখে মৃতের পাশে। এত নিঃশব্দেই এ কাজ করে যে রাজেন চন্দ্র ভয়ে নিরুদ্দেশ হন। তাতে সব সন্দেহটাই স্বাভাবিক ভাবে গিয়ে পড়ে তাঁর উপরে। তাছাড়া মারণাস্ত্রটাও পাওয়া যায় তাঁর তাঁবুতে। মৃতের পাশে তাঁরই রুমাল। পুলিশ থেকে সব বিখ্যাত সংবাদপত্রে তাঁর ছবি ছাপিয়ে তার খোঁজ করা সুরু হয়।

এদিকে ফোরেনসিক পরীক্ষায় দেখা গেছে মোটা লোহার পাইপে যে সব হাতের আঙ্গুলের ছাপ আছে তার একটাও রাজেন চন্দ্রের নয়। তাতে যে ছাপ আছে তার প্রায় সব গুলোই রবি কুমারের আর্দালি চরণ সিং এর হাতের আঙ্গুলের ছাপ। চরণ সিং তার দোষ স্বীকার করেছে। এই ঘোষণায় এও জানান হচ্ছে, রাজেন চন্দ্র যেখানেই থাকুন না কেন তিনি যেন তার ডিউটিতে ফিরে যান। প্রজেক্ট অথরিটি তাঁর অনুপস্থিতির সময়টুকু ক্ষমতাবলে বিশেষ ছুটি বলে ঘোষণা করবে।'

সবাই দেখল আসগর আলি মাথা নীচু করে বসে আছেন। তার দুচোখ ছল ছল করছে।

সন্তু, বলল, 'চাচা, ও তাহলে ডাকাত নয়।'

শাশা বলল, 'চোর ডাকাত বুঝিনা। আমিতো বেঁচে আছি ওর জন্যই। বাবা তুমি ফিরে গিয়ে পেপারে ওর কথা লিখো, ওর বাড়ি কোথায়, কে আছে ওর চাচা?'

মাথা নাড়লেন আসগর আলি, ছুটিতে আছেন উনি। এক আত্মীয়কে ডাউন ট্রেনে তুলে দিতে এসেছিলেন স্টেশনে, হঠাৎ টিকিট লাইনে ওকে দেখতে পান। টিকিট ক্লার্ককে পরিচয় দিয়ে জানতে পারেন কোথায় যাচ্ছে ও। এও জানেন, যে ওর চালচলন স্বাভাবিকনয়। নিজের দায়িত্বে উনি ওকে তাড়া করেছিলেন, ভেবেছিলেন মাঝাণ্ডিতে গাড়ি থামলেই ওকে এ্যারেস্ট করবেন। ও আর কোনদিনও মাঝাণ্ডি পৌঁছাবেনা। কেন যে ওর এমন করে দেখা হয়েছিল ওর সঙ্গে।

সন্তু বলল, 'আমি যাই চাচা, মা বাবার কাছে। সময় পেলে আপনি যাবেন তো আমাদের বাড়িতে ধুমল গড়ে?'

মাথা নাড়লেন আসগর আলি।

প্রথম ব্যাচ চলে গেল বোটে। শাশাও গেল

সে বোটে। মাসিমা বললেন, 'মুসলমান বলে ধোঁকা দিতে গেছিলে আমার কাছে, পারনি বাবা। তা তুমি যতবড় পুলিশের কর্তাই হও। সাবধানে থেকো বাবা। এসো কিন্তু আমাদের ওখানে ধুমল গড়ে।'

হেসে আসগর আলি বললেন, 'যেতে তো হবেই মাসিমা, দাদার লুঙ্গি পাঞ্জাবীটা তো আর চুরি করতে পারিনা।'

সবাই হেসে উঠল। মেয়েদের বাচ্চাদের নিয়ে বোট চলে গেল। দ্বিতীয় দফায় যারা যাবে তারা তৈরি হয়ে থাকল।

অবনীবাবু বললেন, 'আহা সে বেচারার জন্য মনটা কেমন করছে। অপবাদ নিয়েই চলে গেল অতবড় প্রাণটা।'

কারও মুখে কোনো কথা ছিলনা।

আসগর আলির কানে ভাসছিল সেই কথাগুলো, 'আপনি কি আমাকে চেনেন?' জিজ্ঞাসা করেছিল ও। না, না, যতবড় পুলিশ অফিসারই হন না কেন উনি, মানুষ উনি চিনতে পারেন নি এখনও। মানুষ চিনতে ওঁর এখনও অনেক বাকী।

উঁচু ক্লাসের কজন প্যাসেঞ্জার এগিয়ে এসে বললেন, 'নেক্সট ব্যাচে যাতে আমরা যেতে পারি তার ব্যবস্থা করবেন কি দয়া করে?'

মাথা নাড়লেন আসগর আলি।

'থ্যাংকস্ বলে' ওরা চলে গেল।

গার্ড সাহেব এগিয়ে এসে বললেন, 'আমি, আপনি, ড্রাইভার আর তার হেল্পার, আমরা কজন সব শেষ ব্যাচে যাব। পুরো চেক করে যাব যে কেউ আর পড়ে নেই পিছে। তবে না স্বস্তি।'

এবারেও মাথা নাড়লেন আসগর আলি।

সবাইকে কি নিয়ে ফিরতে পারবেন আর ওঁরা? না—না। একজন আর কোন দিনও ফিরে যাবে না!!

: সমাপ্ত :

নামজাদা

সুখেন্দু মজুমদার

খেলা ছেড়ে মনা বোস
মন দিল পাঠেতে,
নাম ডাক ছিল তার
ফুটবল মাঠেতে।

গোটা মাঠে ছোটাছুটি
ঘাম ঝরে সারা গায়,
তবু তার নাম নেই
গোলদাতা তালিকায়।

ফুটবলে গোল করা
নয় কোন ব্যাপারই,
আসলে ছিলেন তিনি
নামজাদা রেফারি!

হিজিবিজিবিজ

ন্যাড়া, খোকা ভয়ানক কাঁদছে। একটু ভুলিয়ে দাও না ভাই। কাজের সময়ে....
নিশ্চয়
আয় খোকা, আ— এই নে পুতুল, বই — পেন নে
আঁ — আঁ — এ্যাঁ
ও বাবা
আয় — পিঠে চড় হেই —
এ্যাঁ--- এ্যাঁ.. আঁ —
এ্যাঁ— এ্যাঁ আঁ....
বাপরে! এই দেখ ন্যাড়া... থাম — চোওপ
বাবাগো — এই নে — বিস্কুট — ব্যাট — সব নে
এ্যাঁ — এ্যাঁ — আঁ.....
এ্যাঁ — এ্যাঁ....
!!!

ভজুদের বাড়ির লোকরা কথায় কথায় অদ্ভুত সব গপ্প বলেন, তার অর্ধেকও বিশ্বাস করা মুস্কিল। তবে শুনতে শুনতে নাওয়া খাওয়া ভুলে সবাই ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়ে দেয়। ওঁরা তো বলেন সব সত্যি। কি জানি। ওঁদের এক দাড়িওলা জটাধারী সৌম্যদর্শন গুরুদেব আছেন। কোথায় কোন পাহাড়চূড়োয় অজ্ঞাতবাস করেন, তার হদিশ কেউ জানে না। জানবার দরকার-ও নেই। তার কারণ, বাড়িতে কোনো বিপদ-আপদ, ভাবনা চিন্তা, ফ্যাসাদ-সমস্যা—আর শুধু তাই কেন ছোট খাটো মতভেদ, রেষারেষি, বা অন্য রকম ঝগড়াঝাটির কারণ যেই দেখা দিত, সম্ভবতঃ যোগবলে সে-কথা জানতে পেরে, মহা রেগেমেগে দুচক্ষু লাল করে, কমণ্ডলু ভরা আকাশীগঙ্গার জল নিয়ে, খটখট খড়মের শব্দ করতে করতে একবার যেই দেখা দিতেন, মুখেও তাঁকে কিছু উচ্চারণ করতে হত না। তাঁর দর্শন পেয়েই সব জলের মতো সহজ হয়ে যেত। শত্রুরা বিদেশ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ত, অবাধ্যরা পোষ মানত, সকলে একমত হয়ে, গুরুসেবায় লেগে যেত। বিশেষ করে যখন গুরুদেব কোনো পার্থিব জিনিস, খাদ্যদ্রব্য স্পর্শ করতেন না, তাঁর জন্য কারো এক পয়সা খরচা-পাতি হত না।

অন্য লোকে বিশ্বাস করুক আর নাই করুক ভজুর বুড়ো ঠাকুরদাকে আমি নিজের কানে বলতে শুনেছি যে তাঁর অতি বৃদ্ধ প্রপিতামহের হিসাব খাতায়, বেগ্‌নি কালি দিয়ে স্পষ্ট করে লেখা আছে তিনি নিজে পড়েছেন এবং নেহাৎ খাতাটা কোথায় রেখেছেন আপাততঃ খুঁজে পাচ্ছেন না, নইলে আমাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতেন যে উনিই সেই প্রাচীন পুঁথিপত্রে উল্লেখিত স্বয়ং দুর্বাসামুনি! রেগে গেলে একবার চক্ষু তুলে তাকালেই হল। সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখস্থ ব্যক্তির জায়গায় স্রেফ্ দেখবে এক টিপ গোলাপি বিড়ির ছাই !!

সে যাই হক এঁরা সকলেই তাঁকে বলতেন দুব্বোঠাকুর। এক, মেজদাদু ছাড়া সকলে ভারি ভক্তিও করতেন। ঐ মেজদাদুটি বেজায় অবিশ্বাসী আর রগচটা। বাড়িতে কোনো গোলমালের উপক্রম দেখলেই বলতেন, 'এর পরেই তো সেই বুড়োর আগমন হবে। সময় থাকতে আমি অদর্শন হই।' এই বলে কেটে পড়তেন। সবাই তটস্থ হয়ে উঠতেন, মেজবাবু অ্যাবসেন্ট হলে পর যদি কারো কড়া ব্যামোব্যাধি হয়, তখন কি পাঁচুডাক্তারকে ডাকা হবে? বড়কাকা পাঁচু ডাক্তারের নাম শুনে চটে আগুন। 'কখনোই না। গোপাল কবরেজকে ডাকা হবে। নেভার পাঁচু। ব্যাটা একটা গুণ্ডা ছাড়া কিচ্ছু নয়! ছোটবেলায় স্রেফ আমাদের পিটিয়ে যার যত ছোট বড় গুলি থাকত সব নিয়ে নিত। ওর পকেট ছিঁড়ে যেত। নাকি মেডেল পাওয়া বড় ডাক্তার হয়েছেন—নিশ্চয় স্রেফ—' যাই হোক মানহানিকর কিছু বলার আগে বড়দাদু বললেন, 'আহা, চটিস্ কেন? দুব্বোঠাকুর জানেন না এমন জিনিস নেই। ওঁর পেটের অসুখের পুরিয়া

যে খায়নি সে বড় দুর্ভাগা !' এই বলে শূন্যে নমো করতে লাগলেন আর কাকে যেন বলতে লাগলেন 'ক্ষ্যামা দে ভাই, ক্ষ্যামা দে !'

বাড়ির ছোটরাও দুব্বো ঠাকুরকে ভারি ভয়—ভক্তি করত। ভারি ইন্টারেস্টিং চেহারা দুব্বোঠাকুরের। গোঁপদাড়ি জটাজুট দেখলে হিংসে হয়। তার ওপর ডান ভুরুর ওপরে অদ্ভুত একটা তিল। ঠিক যেন খুদে একটা লালচে কাঁকড়া-বিছে ! গুরু রাগলে ঐ তিলটাও নাকি আলাদা ভাবে রেগে দাঁড়া নাড়ে ! সে এক বিকট দৃশ্য। তবে গুরুর যে যেমন বুদ্ধি তেমনি দয়া, তাতে কোনো সন্দেহও নেই আর সন্দেহ করার সাহসও নেই।

আবহমানকাল থেকে ভজুদের পরিবার বেশ সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যেই দিন কাটাচ্ছিল, হেন কালে মহা বিপর্যয় উপস্থিত হল। আইন হল কোনো মালিক এতটার বেশি জমিজমা রাখতে পাবে না। সঙ্গে সঙ্গে ভাবা যায় না সে কি অশান্তি শুরু হয়ে গেল। সে আর মুখে বলা যায় না। মেজদাদু আগে থেকেই একটা কেস নিয়ে বিলেত গেছিলেন কাজেই আর অশান্তি করার কেউ ছিল না। অন্যরাও নিশ্চিন্ত যে কোনো-দিন কপালে কাঁকড়া-বিছে নিয়ে হন্তদন্ত হয়ে এসে দুব্বোঠাকুর যেমন করে হক, সমস্যা মিটিয়ে দেবেন। বড়দাদু রেগে বললেন, 'কলিযুগ শেষ হয়ে এল, দুব্বোঠাকুরের বয়ে গেছে আমাদের জমিজমার সমস্যা মেটাতে।' বড় কাকাও চটে গিয়ে বললেন, 'কেন, সেবার জামাই ষষ্ঠীর সময়ে তোমার সঙ্গে—' 'হয়েছে, হয়েছে, সে সব কবে চুকেবুকে গেছে এবং আমি ঠিকই বলেছিলাম। তখন ঠাকুরের হতে দেদার সময় ছিল। এক সময় তো তিনি আমার ঠাকুরদার চন্দন কাঠের খড়ম-ও খুঁজে দিয়েছিলেন। এখন সময় পাল্টেছে, বটুর রুগী এমনি মৎলবী যে বেছে বেছে বেছে ঠিক এই সময়ই ব্যামো পাকাল ! সব একেকটা ওয়্যাঃ।'

তারপর সেই প্রাচীন হারিয়ে পাওয়া খড়ম পরে কয়েক মিনিট খট-খট করে পাইচারি করে বললেন, 'এ্যাই ভজু !' ভজু বলল, 'এ্যাঁ ?' 'ওটা কি কুড়োলি ?' ভজু বলল, 'কিছু না।'

'তোকে একবার বদরিনারায়ণ যেতে হবে।'

'কেন ?'

বড়দাদু বললেন, 'আমার সেই বন্ধুর বাত বেড়েছে। তাকে আমার বাতের মাদুলীটে দিয়ে আসতে হবে।' ভজু বলল, 'আমাদের ক্লাবের খেলা আছে। আমি যেতে পারব না।' 'আহা, এমনি এমনি যেতে বলছি নাকি ? কি চাস্ বল্।' মৌকা পেয়ে ভজু বলল, 'তা হলে আমি বি-কম পড়ব না। অনিমেষ জ্যাঠার কারখানার কাজে ঢুকতে দিতে হবে। পড়াশুনো আমার কম্ম নয়।'

কাষ্ঠ হেসে বড়দাদু বললেন, 'বেশ, তাই হবে।' আর ভজুকে পায় কে ? পরদিনই রওনা। আর বিশ্বাস কর আর নাই কর, তার পরদিন দৈববলেই বোধ হয় সব জানতে পেরে, সন্ধ্যেবেলায় গুরুদেব বড়দাদুদের তাসের আড্ডার ঘরে হাজির হয়ে চোখ পাকিয়ে রেগে বললেন, পায়ের তলা থেকে পৈত্রিক ভুঁই খসে যাচ্ছে আর তোরা তাস পেটাচ্ছিস্ ! শেম্ ! শেম্ ! কোথায় অনির্বানের কথা মতো নিজেদের মধ্যে খ্যাঁচাখেঁচি বন্ধ করে বিনোদ উকীলের কথামতো চলবি, তা নয়। ইডিয়ট ! ফুল্ !

বাবা ! তেজ দেখে আমি হাঁ ! বলেছি কি তাসের দর্শক হিসাবে আমিও ছিলাম ? আর বিশ্বাস কর—আর নাই কর দুব্বোঠাকুরকে আমার কেন জানি বড্ড চেনা-চেনা মনে হচ্ছিল। গালের অদ্ভুত আঁচিলটা ভারি ইন্টারেস্টিং। আবার একটা দাঁড়া কম। হয়তো দু-মিনিটের মধ্যে গুরু খট্ খট্ করে সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেলেন !

সে যাই হক। সব সমস্যা সঙ্গে সঙ্গে মিটে গেল। বাড়তি জমি উঁচু দরে বিক্রি হল। সবাই তার ভাগ পেয়ে ঝগড়াঝাটি ভুলে গেল। দিন পনেরো পরে বদরিনারায়ণ থেকে ভজু ফিরে এল, লাল টকটক করছে গাল দুটো। যদিও কয়েক দিনেই কালচে মেরে গেল। ততদিনে হায়ার সেকেণ্ডারির ফল বেরিয়ে গেছিল। ভজু দেবতাদের আশীর্বাদে এত কম নম্বর নিয়ে পাস করেছিল যে বি-কমের কথা কেউ মুখে না এনে খুশি মনে ওকে আমার বাবার কারখানায় আমার সঙ্গে ভরতি করে দিল।

সব ভালোভাবে শেষ হল। খালি একটা কথা না বলে পারছি না। ভজু বদরি যাবার আগে আমার "ড্র্যাগনের নিশ্বাস" বইটা চেয়ে নিয়ে ছিল। ফিরে এসে; ফিরিয়েও দিয়েছিল অনেক দিন পরে। সেটি খুলতেই, একটা প্ল্যাস্টিকের কাঁকড়াবিছে মাইনাস্ ওয়ান দাঁড়া ওর পাতার মধ্যে থেকে টুপ করে মাটিতে পড়ল। আমি তো হাঁ। ভজু সেটি তুলে পকেটে পুরে বলল, 'ভাবনার কিছু নাই রে! নতুন একটাকে চীনে বাজার থেকে কিনে, বড়দাদুর ইউনিফর্মের সঙ্গে গুঁজে দিয়েছি। বাবা! সত্যি দুব্বোঠাকুরের শক্তি দ্যাখ্! আমাকে ৪১ নম্বর পাইয়ে এই বহু-আকাঙ্ক্ষিত কারখানায় এনে ফেললেন!' এই বলে কাকে জানি নমো করল।

সেই অগুন রাঙা দিনগুলির কথা

করুণাময় বসু

আমার বয়স তখন চৌদ্দ কি পোনর। স্কুলের উঁচু ক্লাসে পড়ি। চারদিকে স্বদেশী আন্দোলনের বাঁধ ভাঙা জোয়ারের ডাক। সেই অনতিক্রান্ত কৈশোর সীমান্তে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একদিন বুকের গোড়ায় অনুভব করলাম ভারতবর্ষের মাটি তেতে উঠেছে। দুচোখ জ্বালা করে উঠল, নিশ্বাসে বারুদের গন্ধ পেলাম। জ্ঞান হওয়া অবধি শুনে আসছি প্রফুল্ল চাকী, কানাই লাল, সত্যেন, ক্ষুদিরামের কথা। দেওঘরে প্রথম তৈরি বোমা ফেটে যাঁর শরীরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিল, সশস্ত্র আন্দোলনের সেই প্রথম শহীদ প্রফুল্ল চক্রবর্তীর চরম আত্মোৎসর্গের কথা। আলিপুর বোমা মামলার আসামী অরবিন্দ, বারীন, উপেন্দ্রনাথ, উল্লাস কর দত্তের কথা। ১৯১২ সাল, ২৩শে ডিসেম্বর দিল্লীতে বড়লাট লর্ড হার্ডিঞ্জের শোভাযাত্রার উপর বোমা ছোঁড়া ঘটনার পিছনে যাঁর প্রত্যক্ষ হাত ছিল, যিনি পরে পি. এন. ঠাকুর ছদ্মনামে চিরকালের মত ভারতবর্ষের মাটি ত্যাগ করেছিলেন, সেই মহাবিপ্লবী রাসবিহারী বসুর কথা। তারপর কানে এল বালেশ্বরের বুড়িবালাম নদীর তীরে সেই অবিস্মরণীয় সংগ্রামের কথা। বাঘা যতীনের সহযোদ্ধা চিত্তপ্রিয় রায়চৌধুরী নাকি উড়ন্ত পাখির চোখে গুলিবিদ্ধ করতে পারতেন। অভ্রান্ত লক্ষ্য ছিল তাঁর। এই সব নামগুলো স্বপ্নের জোনাকির মত আমার ঘুমের মধ্যে আনাগোনা করত। আলো হয়ে জ্বলত, নিবত। কখনো কখনো ঘুম ভেঙে যেত। উঠে অস্থির হয়ে ঘরের মধ্যে পায়চারি করতাম।

আমাদের গাঁয়ে তখন অনুশীলনী কেন্দ্রের একটা শাখা অফিস ছিল। আমি একদিন সেখানে গিয়ে নলিনী মামাকে বললাম, 'আমাকে কাজ দিন। দেশের কাজ করতে চাই আমি।'

নলিনী মামা হো হো করে হেসে উঠে আমার পিঠে একটা ঘুঁষি লাগালেন, বললেন, 'যা, যা, শরীর তৈরি কর আগে। মজবুত ইস্পাতের মত লোহাপেটা শরীর। তারপর চরিত্র গঠন। সে বড় শক্ত কাজ সুহাস। সময় হলে ডাকব। এখন যা। মাঝেমাঝে পার্টির ক্লাসে আসিস।'

মনে আছে কাঁদতে কাঁদতে ফিরে এসেছিলাম। এর কিছুদিন পরে কানাঘুঁষো শুনলাম একজন ডাক সাইটে বিপ্লবী এই গ্রামে আত্মগোপন করে আছেন। শুনেছি শ্রীশ মিত্তির, ডাক নাম হাবুল, যিনি গরুর গাড়ীর গাড়োয়ান সেজে রডা কোম্পানীর পিস্তল আর কার্তুজ গাড়ীতে তুলে মিলিটারি ডিপোতে না নিয়ে গিয়ে সোজা মলঙ্গা লেনে বাঘা যতীনের আড্ডায় পৌঁছে দিয়ে এসেছিলেন, তিনিই ছদ্মনামে এই গ্রামে কিছুদিন বাস করে গিয়েছেন। এ খবর বড় কেউ জানত না। নলিনী মামার কাছে প্রথম শুনি এ কথা। তিনি বারণ করেছিলেন কাউকে বলতে। বোধহয়

আমাকে বিশ্বাস করেছিলেন। হাবুল মিত্তিরকে আমরা মাস্টারমশাই বলে ডাকতাম। তাঁর হাতেই এই গাঁয়ের অনুশীলনী কেন্দ্রের ভার পড়ে। সেই ভার মাস্টার মশাই অর্থাৎ হাবুল মিত্তির হাসিমুখে শক্ত হাতে বহন করে গিয়েছেন, যতদিন এই গ্রামে ছিলেন। তিনি আমাদের গেমস মাস্টার ছিলেন। কুস্তি, লাঠিখেলা, ছোরা খেলা, যুযুৎসুর নানা প্যাঁচ, কসরত শেখাতেন। কখনো কখনো ক্লাস নিতেন। নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। সবই নানা দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের আন্দোলনের কথা। কখনো বলতেন কি ভাবে ইংরেজরা ভারতবর্ষ শোষণ করছে। উদাহরণ তুলে বুঝিয়ে দিতেন। বলতে বলতে কখনো তাঁর গলার স্বর বিকৃত হয়ে যেত। ইংরেজের প্রতি তীব্র ঘৃণা, বিদ্বেষ ঝলসে উঠত তাঁর বাচনভঙ্গীতে। কখনো কখনো রবীন্দ্রনাথের কবিতা আবৃত্তি করতেন। উদ্দীপ্ত কণ্ঠে বলতেন, 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী, ভয় নেই ওরে ভয় নেই। নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান, ক্ষয় নেই, তার ক্ষয় নেই।'

কখনো কখনো বেসুরো গলায় গান গেয়ে উঠতেন, 'আগুন আমার ভাই, তোমারি জয় গাই। তোমার শিকল ভাঙা এমন রাঙা মূর্তি দেখি নাই।'

পুলিশের নজরে পড়তে খুব বেশী দেরী হলনা। এই গ্রামে একজন পুলিশের টিকটিকি ছিল, হরিদাস মুখুজ্জে তার নাম। সেই সম্ভবতঃ খবর যথাস্থানে পৌঁছে দিয়েছিল।

বেলা দশটা। আমরা বইপত্তর নিয়ে স্কুলে যাচ্ছি। দেখি স্কুলের পাশে একটা চা-এর দোকানে বসে মাস্টার মশাই চা খাচ্ছেন। তাঁর গায়ে একটা ঢোলা বেঢপ কোট। একটু দূরে একটা কৃষ্ণচূড়া ফুলগাছের তলায় দুজন দাঁড়িয়ে আছে। ষণ্ডামার্কা একজন, আর এই

টিকটিকি হরিদাস মুখুজ্জে।

তারা দু পা এগিয়ে আসতেই মাস্টারমশাই উঠে দাঁড়ালেন। যেন ছায়া দেখে আঁচ করে নিয়েছেন এরা কারা।

'এই যে হাবুল বাবু,' বলে যেই না সেই ষণ্ডামার্কা লোক, আর হরিদাস মুখুজ্জে মাস্টার-মশাইকে জাপটে ধরতে যাবে, মুহূর্তের মধ্যে তিনি দুহাত পকেটে ঢুকিয়ে দুটো পিস্তল সামনে তুলে ধরে বললেন। 'এক পা এগুলে দুজনের মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।' তারা বোধহয় এতটা ভাবতে পারেনি। পিছন ফিরে ঊর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে লাগল, সম্ভবতঃ থানায় খবর দিতে। আর তাদের পিছনে পিছনে ক্ষ্যাপা নেকড়ের মত দুহাতে পিস্তল উঁচিয়ে তেড়ে তেড়ে কিছু দূর গেলেন মাস্টারমশাই। আমরা স্কুলের ছেলেরা হাততালি দিয়ে 'দুয়ো দুয়ো' বলে চীৎকার করতে লাগলাম। কেন যে মাস্টারমশাই গুলি করে মারলেন না ওই জানোয়ার দুটোকে, এই ঘটনা চিরদিন রহস্যই থেকে গেল আমার কাছে। এই গাঁয়ে মাস্টারমশাইকে আর কোনদিন দেখা যায় নি।

তিনচারদিন পরে একজন দেহাতী চাষী লোকের হাতে মাস্টারমশাইর লেখা একখানা চিরকুট পেলাম। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন। গাঁয়ের লোকটি বললে, 'পরশু ছুটি আছে। আমি বেলা একটার সময় রাণী দীঘির দক্ষিণ দিককার ঘাটে দাঁড়িয়ে থাকব। সাইকেল আছে, অসুবিধা হবে না।'

বিকেল তিনটের অনেক আগেই পৌঁছে গেলাম এক অজ পাড়াগাঁয়ে। কখনো সে গ্রামে যাইনি, নাম শুনলাম খয়রাডাঙা। খড়ের ঘর। লোকালয় থেকে একটু দূরে, মাঠের কাছাকাছি। গাছ গাছালিতে ঢাকা জায়গাটি বেশ শান্ত, মনোরম। ঘরে ঢুকতেই মাস্টারমশাই আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এই যে সুহাস, এখানে বস।' তিনি মাদুরে বসে কি একখানা বই পড়ছিলেন। আমি তাঁর পাশে বসলাম। জানলার ধারে একটা ছোট টেবিল, পাশে চেয়ারে বসে একজন টেবিলে ঝুঁকে কি লিখছিলেন। বেশী বয়স না, তেইশ চব্বিশ হবে, কী দীপ্তি চোখেমুখে! আমি অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিলাম। তিনি আমাকে লক্ষ্য করে একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি দেখছ খোকা?'

লজ্জা পেয়ে মুখ ফিরিয়ে নিলাম। মাস্টার-মশাই জিজ্ঞেস করলেন, 'ক্লাস কেমন চলছে?'

বললাম, 'ভালোই চলছে। সব দেখাশোনার ভার এখন নলিনী মামার উপর পড়েছে। আপনি কবে আমাদের গ্রামে ফিরে যাবেন?'

একটু হাসলেন তিনি। বড় স্নিগ্ধ, বড় করুণ সে হাসি। বললেন, 'আর বোধহয় ফেরা হবে না। আমি দু একদিনের মধ্যে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। দেশে থাকলে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট আমাকে ছাড়বে না। ভারতবর্ষের বাইরে চলে যাব। যা শিখিয়ে গেলাম, মনে রাখবে সব। ডাক পড়লে ঝাঁপিয়ে পড়বে।'

'কবে ডাক আসবে?' ব্যাকুল কণ্ঠে প্রশ্ন করলাম।

নিরাসক্ত কণ্ঠে হাবুল মিত্তির জবাব দিলেন, 'কি করে জানব সুহাস? সব সময় তৈরি থেক।'

'আমাকে আর কিছু বলবেন?'

'তোমার কাছে আমার যে বইগুলো আছে, নষ্ট করে ফেলো। পুলিশের হাতে না পড়ে। এই কথা বলার জন্যেই আমি তোমাকে ডেকেছিলাম।'

'আবার কবে দেশে ফিরে আসবেন?'

'তা কি বলা যায়? না ফিরে আসার সম্ভাবনাই বেশী।'

হঠাৎ আমার দুচোখ ঝাপসা হয়ে গেল। মাস্টারমশাইর পায়ে দুহাত রেখে প্রণাম করলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন।

হঠাৎ দূর থেকে ভারী বুটের আওয়াজ কানে ভেসে এল। মাস্টারমশাই ও তাঁর সঙ্গী দুজনেই দাঁড়িয়ে উঠলেন। জামার পকেটে হাত ঢুকোলেন দুজনেই।

মাস্টারমশাই বললেন, 'পুলিশ খবর পেয়েছে আমাদের। তুমি পিছনের দরজা খুলে বেরিয়ে যাও সুহাস। পিছনে আখবন। আখবনের ভিতর দিয়ে একটু গেলেই মাঠ দেখবে। তারপরেই গ্রাম। সেখানে জিজ্ঞেস করে বাড়ি ফিরে যাও। ভয় করোনা। এর চাইতে অনেক মারাত্মক ঘটনার মুখোমুখি হতে হবে পরে।'

আমি বন্দুক চালাতে এখনো শিখিনি। এখানে থাকাও নিরাপদ নয়। দরজা খুলে আখবনে গা ঢাকা দিলাম। ততোক্ষণে সুরু হয়ে গিয়েছে বন্দুকের গুলির আওয়াজ। দু পক্ষেই গুলি বিনিময় হচ্ছে বুঝতে পারলাম। কজন পুলিশ এসে ঘেরাও করেছে তাও জানিনে।

মাস্টারমশাই আর তাঁর সঙ্গী কিভাবে আত্মরক্ষা করবেন, ভেবে আকুল হলাম। মুহুর্মুহু গুলির আওয়াজ। নিকটে মাদারপলাশ গাছে কটা পাখি বসে ছিল, ডাকতে ডাকতে উড়ে চলে গেল।

হঠাৎ দেখি আখবনের ভিতর দিয়ে হাবুল মিত্তির, আমার মাস্টারমশাই দৌড়ে চলে গেলেন। অঝোর ধারায় রক্ত ঝরছে গা বেয়ে। গুলির আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল একটু পরে। মাস্টারমশাইর সঙ্গী সেই পুলিশ এনকাউন্টারে মারা গিয়েছিলেন, পরে শুনেছি একথা। কি তাঁর নাম বহু চেষ্টা করেও জানতে পারিনি আমি।

সেই আখবনে দাঁড়িয়ে আবার দু চোখ জলে ভরে গেল। মনে মনে প্রশ্ন করলাম, 'বলে যাও কে তোমরা? কিসের লোভে, কী পরম প্রাপ্তির অন্বেষণে, কোন আদর্শের হাতছানিতে ঘর সংসার ভেঙে চুরে তচনচ করে পথে প্রান্তরে বেরিয়ে পড়েছ। উন্মাদের মত দেশ বিদেশে ঘুরে বেড়াও। পুলিশের ভয়ে বনেজঙ্গলে, চাষীর খড়ো ঘরে, ধানক্ষেতে, আমবাগানে আত্মগোপন করে বিপ্লবের মশাল জ্বালিয়ে রেখেছ। এই যে এত রক্ত ঢেলে দিলে, এর মূল্য দেবে কে?'

আমি সেখানে নতজানু হয়ে মাটিতে মাথা রেখে সেই অগ্নিযুগের মহাবিপ্লবীদের উদ্দেশে সশ্রদ্ধ নমস্কার নিবেদন করে গেলাম।

হাবুল মিত্তিরকে আর কোনদিন ভারতবর্ষের মাটিতে দেখা যায় নি। শোনা যায় বর্মা-চীন সীমান্ত অতিক্রম করতে গিয়ে তিনি চীনা সীমান্ত রক্ষীর গুলিতে নিহত হন। কাগজে পরে পড়েছি এ কথা।

সোভিয়েত দেশ থেকে প্রকাশিত
ছোটদের জন্য মনমাতানো বই, পত্রপত্রিকা,
পোস্টেজ স্ট্যাম্প-এর অন্যতম বৃহত্তম পরিবেশক—
ভস্তক
(হাউস অফ্ সোভিয়েত বুকস্ এ্যাণ্ড পিরিওডিকালস্)
এ-সি ২১০ সল্ট লেক, কলিকাতা-৭০০ ০৬৪
৭ ক্যামাক স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০১৭
৭৯ মহাত্মা গান্ধী রোড. কলিকাতা-৭০০ ০০৯
সেন্ট্রাল রোড, শিলচর, অসম
যশবন্ত রোড, পানবাজার, গুয়াহাটী, অসম
সোভিয়েত পত্রিকার গ্রাহক হয়ে মস্কোতে
মুদ্রিত ক্যালেণ্ডার উপহার নিন।

"দ্রোণফুল লেগে আছে মেরুণ—শাড়িতে তার,
নিম—আমলকি পাতা হালকা বাতাসে
চুলের উপরে উড়ে উড়ে পড়ে....."
..... জীবনানন্দ দাস
অনুশ্রী
বালুচরী, টাঙ্গাইল, শান্তিপুরী, পলিকট শাড়ী
এ ছাড়াও
তাঁত ও ছাপা বেডসীট ও বেড কভার
রং—বেরঙের কম্বল
[illegible]
(পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সমবায়ের সংস্থা)
৮-এ রাজা সুবোধ মল্লিক স্কোয়ার
(৭ম তল) কলিকাতা-৭০০০১৩

টোটোর অ্যাডভেঞ্চার

এদিকে
টোটো পাগলামি কোরনা আমার কথা শোন..
আমি ঠিক আছি প্রোফেসর যারা নিজেদের স্বার্থে এত গুলো লোকের জীবন বিপন্ন করে তাদের ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়!!
ছেলেটার বড্ড মাথা গরম। বড়দের কথা শোনে না!!
অন্যদিকে
এবার বারুদ্দাও আমার হবে। কাজ হাসিল হ'লে সাম্বাটুকে একটা ব্যবস্থা করতে হবে!!
বাঁধের কাজের ওখানে
তোমরা কেউ ইরোপোর আস্তানা জান?
শুনেছি ঐ পাহাড়ে থাকে
সান্টা ইরোপোর আস্তানা জানে মনে হয়
সান্টা কোথায় জানি কি?
আজ সকালেই ওকে দেখলাম
সান্টা ঐ পালাছেলেটা তোর খোঁজ করছে। বোরোপোকে বলে দে
যাই খবরটা দিয়ে আসি যে এদিকের হদিস পাওয়া গেছে।
প্রোফেসর আমি পাহাড়ের ওদিকটা একটু খুঁজে দেখছি শিবশম্ভু আমার সাথে থাকুক
সবখানে যেও
আবার না একটা ঝামেলা বাধায়
যুদ্ধের ব্যবস্থাটা যতটা সম্ভব গোপনে করতে হবে। বারুদ্দায় যেন কোন খবর না যায়

বুঝলে ওরোপো, আমি রাজা হলে তোমায় মন্ত্রী করব তুমি ওঝাগিরি মন্ত্রীগিরি দুটোই করবে হেঃ হেঃ
বোরোপোকে প্রধান ওঝা করব
শিম্পু গাছে বেশি লাফালাফি করিস না!!
মনে হচ্ছে এখান দিয়ে মানুষজন যাতায়াত করে
দাদা খবর না পেয়া অব্দি চুপচাপ থাকতে হবে।
বোরোপো, তোমাকে আর ওরোপোকে সবাই খুঁজছে। এবার কি করবে ভেবেছ?
এই যে ওঝাবাবু, বেশ আরাম করছ। এবার বোরোপোকে খবর দাও, ৩ লোকজন যোগাড় করুক। যুদ্ধে জেতার পর উরুঙ্গুর রাজাতো আমাদের জামাই আদর করবেনা..
তাই দুটো রাজাকেই খতম করতে হবে! এবার উরুঙ্গু আর বাকুঙ্গার রাজা হতে সম্রাট
রাতের জন্য একটা আশ্রয় দে যাদরকার
ফাঁদ শিম্পু-উ!!
ধ্যুত্ত!! খালি শিম্পু শিম্পু। শান্তিতে একটু গাছে গাছে লাফান যাবে না!!

চলবে

গণেশের কাণ্ড

সুরজিৎ দাশগুপ্ত

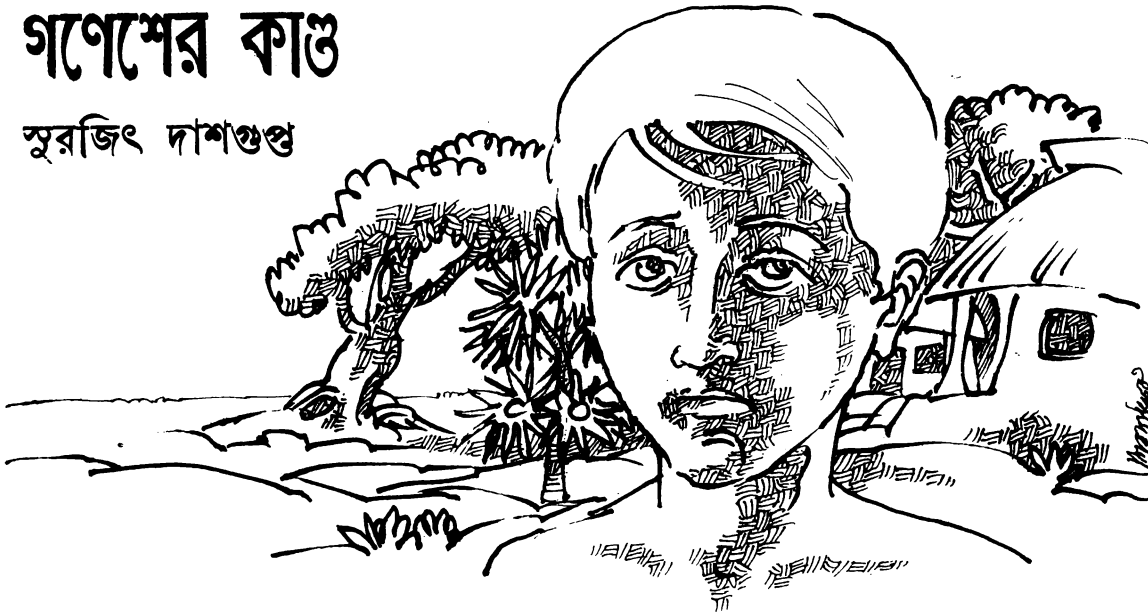

আজ শিবরাত্রি।

বাবুদের বাড়িতে কাজ সেরে গণেশের মা মন্দিরে যাবে, ফিরে এলে উনুন ধরাবে, তারপর গরম গরম রুটি সেঁকে দেবে গণেশকে।

বিবাগী বাপের ছেলে গণেশ, হেলায় ফেলায় মানুষ হচ্ছে পোড়োভিটের আগাছার মতো। দুধগুড়ের বালাই নেই, বাবুয়ানি বলতে এটুকুই—হাতে হাতে আগুনে সেঁকা গরম গরম রুটি।

ঠাকুমার হয়েছে জ্বালা! বৌ কখন আসবে তার ঠিক নেই। এদিকে নাতির চোখ জুড়ে আসছে ঘুমে। ওর মা যদি এসে দেখে ছেলে ঘুমিয়ে পড়েছে তাহলে উনুন ধরাবার ঝামেলাতেই যাবে না। শিবরাত্তিরে শাশুড়ী-বৌ দুজনেই উপোস। কিন্তু না খেয়ে ঘুমোলে খিদের চোটে নাতির যদি মাঝরাত্তিরে ঘুম ভেঙে যায়?

'ব্যাধ গিয়েছে জঙ্গলে। শিকার খুঁজতে খুঁজতে ব্যাধ গিয়ে পড়ল অচেনা গভীর জঙ্গলে।' গল্প বলে বলে ঠাকুমা গণেশকে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা করল। 'ছেয়ে এল গাঢ় অন্ধকার। চোখে দেখা যায় না শুধু কানে আসে হিংস্র জানোয়ারদের হাঁকডাক। রাত কাটাবার জন্যে ব্যাধ বেচারা গিয়ে উঠল এক উঁচু গাছে। জানত না যে ঐ গাছের নিচে ঝরাপাতায় ঢাকা আছে শিবের থান।'

ব্যাস, বাকিটা বুঝে নিল গণেশ। এ গল্প যে কত শতবার শুনেছে সে। একই গল্প বার-বার শুনতে শুনতে ঘুম পেয়ে যায়। বলল, 'না, ঠাম্মা, অন্য গল্প বলো।' একটু ভেবে বলল, 'আচ্ছা, বাবার সেই গল্পটা বলো—সেই যে কৈলাসে'—

ঠাকুমা আবার শুরু করল, 'তোর বাপ ছোটবেলা থেকেই ছিল শিবের মহাভক্ত। গাজনের সময় সঙ সাজত ফি বছর। বড়ো হয়ে চোত মাসে সন্ন্যাস নিয়ে ভক্ত্যা হতো। মতিগতি দেখে বিয়ে দিলাম। প্রথম বছরটা ভালোই ছিল। সংসারে বেশ মন। তারপর তুই হলি। ভাবলাম, এবার সত্যিসত্যি বাঁধন পড়ল। কিসের বাঁধন? কিসের সাধন? একদিন আমার হাত থেকে তেল নিয়ে নাইতে গেল। সেই যে গেল তো সেই গেল, আর এল না। নদীর ধারে কোন সাধু এসেছিলেন। তাঁর সঙ্গে চলে গেল। নদীর পথ ধরে ধরে পাহাড়-পর্বত ডিঙিয়ে একেবারে কৈলাসে। সেখানে শিব-পার্বতীর নিত্য সেবা করে আর নিত্য প্রসাদ পায়—'

'হ্যাঃ—তুমি গিয়ে সব দেখে এসেছ কিনা!' বলতে বলতে ঘরের মধ্যে এসে দাঁড়াল গণেশের মা। 'অত যার শিবে ভক্তি, বিয়ে করেছিল

কেন? এর নাম ধর্ম? এর নাম ভক্তি? এসব মানুষকে নাকি শিব-পার্বতী ভালোবাসে?'

ঠাকুমা চুপ করে থাকল। এসব প্রশ্নের উত্তর জানা নেই।

মা মন্দির থেকে আনা প্রসাদ গণেশের কপালে ঠেকিয়ে শাশুড়ীর হাতে দিল। তারপর দাওয়ার কোণে উনুন ধরাতে বসল। আর ঠাকুমা গণেশকে নিয়ে এসে বসল উনুনের সামনে। এখনও বাতাসে শীত আছে, এখনও আরাম আগুনের আঁচে।

আগুনের আভা রাতের অন্ধকার ঠেলে কতটুকুই বা এগোতে পারে। বাইরে পৃথিবী জোড়া কালো রাত। দূরে হু হু করে কোথায় পাপিয়া ডাকছে। আর উনুনে চিড়বিড় করে জ্বলছে জ্বালানী কাঠ।

আজ খাওয়ার পেট বলতে একটাই—একা গণেশের পেট। মা আর ঠাকুমার তো শিবরাত্তিরের উপোস। মাখা আটার ডেলা ভেজা ন্যাকড়াতে মুড়ে সেটাকে আবার কাঁচা শালপাতায় মুড়ে মাটির মেঝেতে বাটি চাপা দিয়ে রেখেছিল মা। নতুন করে আটা মাখার হ্যাঙ্গামা নেই। শুধু দু'হাতের চেটোয় চেটোয় মেরে পাট করা, তারপর সটান আগুনে ফেলা, চটপট উল্টেপাল্টে সেঁকে নেওয়া, ফুলে উঠলে চিমটি কেটে আগুন থেকে তুলে নিয়ে ঝপ করে গণেশের থালায় ফেলা।

গণেশ ছুঁয়ে ছুঁয়ে দেখে, চাপাটিটা খাওয়ার মতো ঠাণ্ডা হলো কিনা। এত গরম রুটি মা যে কী করে আঙুলের ডগা দিয়ে ধরে উল্টেপাল্টে দেয়! আঙুল পুড়ে যায় না আগুনে? রুটি দুটো এখনও আগুনে গরম! তাহলে নিশ্চয়ই সেঁকার সময়টাতে মায়ের আঙুলে ছ্যাঁকাও লেগে যায়!

বেচারা গণেশ। রুটির সঙ্গে খাওয়ার আর তো কিছু নেই, শুধু খানিকটা সুন্দর গন্ধভরা গরম বাতাস! এই বাতাস বানাবার জন্যেই আঙুলে ছ্যাঁকা লাগিয়ে লাগিয়ে মাকে রুটি বানাতে হয়। তা না হলে তো গুড় বা ডাল দিয়ে বাসি রুটিতেই চলত।

যতক্ষণ গণেশ বসে বসে খায় ততক্ষণ আগুনের কাছে বসে মা আর ঠাকুমা যত রাজ্যের গল্প-পরামর্শ করে। শিবরাত্তিরের সলতে! তার কপালে শুধু শুকনো রুটি! না একটা সব্জী বা একটু চাটনী। আবার তারা পরামর্শ করতে থাকে, চড়কের মেলাতে তেলেভাজার একটা দোকান দিলে কেমন হতো! দুটো পয়সা বাড়তি রোজগারের জন্যে আর কি! বাবুদের বাড়ির মায়েরা ছুটি দিলে তবে তো দোকান দেবে মেলাতে! ও দোকান চালানো একা ঠাকুমার কাজ নয়। মাকেও চাই। সবই এখন বাবুদের বাড়ির মেয়েদের মন-মর্জি।

অত-শত বোঝে না গণেশ। পরদিন বন্ধুদের জানিয়ে দেয় কথাটা! সংক্রান্তিতে তার মা-ঠাকুমা তেলেভাজার দোকান দেবে। অনেক পয়সা পাবে। গণেশকেও কিছু পয়সা দেবে। অনেক জিনিস কিনবে তারা, অনেক জিনিস।

'কী কিনবি রে, গণেশ?' হঠাৎ প্রশ্ন করল অমিত।

তাই তো, কী কিনবে সে, ভাবতে লাগল গণেশ।

ততক্ষণে ববি বলল, 'আমি একটা মেসিন-গান কিনব—ঠা-ঠা-ঠা'—বলতে বলতে গণেশের দিকে কল্পিত মেসিন-গানটা তাক করে মুখে আবার আওয়াজ করল, '—ঠা ঠা ঠা।'

রাজা বলল, 'আমি কিনব গাড়ি—ইয়া লম্বা নিচু লাল গাড়ি—চিলের মতো সাঁ করে উড়ে যাবে রাস্তা দিয়ে।' নিজেই সাঁ করে ছুটে গেল খানিকটা।

সুনীল বলল, 'আমি কিনব ক্রিকেটের লাল ডিউজ বল আর—মাথার টুপি।'

তখন গণেশের মনে পড়ল, সেদিন ওরা তাকে ব্যাট করতে দেয়নি, শুধু বল ধরার জন্যে মাঠে দাঁড় করিয়ে রেখেছিল। ও যখন ব্যাট করার জন্যে পেড়াপিড়ি করল, ওকে মাঠ থেকে বার করে দিয়েছিল। যারা ব্যাট-বল কেনার চাঁদা দিয়েছে শুধু তারাই ব্যাট করতে পারবে।

চাঁদা না দিয়ে ব্যাট করতে চাইলে একেবারে খেলা থেকেই বাদ, সোজা মাঠের বাইরে।

'এই শোন, শোন—আমি কী কিনব,' বেশ গলা চড়িয়ে গণেশ জানাল, 'আমি একটা মাঠ কিনব।'

'মাঠ?' সবাই অবাক। "মাঠ আবার কী?'

'মাঠ, খেলার মাঠ,' সগর্বে বলল গণেশ, সবাই খেলবে সেখানে।'

বন্ধুরা হাহা করে হেসে উঠল। 'সবাই খেলবে এমন মাঠ? তেমন একটা মাঠের দাম কত জানিস?'

গণেশ ভাবচ্যাকা খেয়ে জিজ্ঞস করল, 'কত দাম?'

'অনেক, অনেক দাম,' বলে হৈ-হৈ করে হাসতে লাগল।

গণেশের চোখে জল এসে গেল।

মজা পেয়ে ববি, রাজা, সুনীল, সঞ্জয় সবাই হাততালি দিয়ে হাসতে লাগল। 'তেঁতুল পাতার মুরোদ নেই, মাঠ কিনবে। যা-যা, ভাগ!'

মনের দুঃখে গণেশ সেখান থেকে ছুটে পালাল। আর কক্ষনো সে ওদের সঙ্গে খেলবে না। কথাও বলবে না! অনেক ভালো দত্তদের এই আম বাগান। গাছের ডালে ডালে আমের মুকুল, বাতাসে তার মিষ্টি গন্ধ। হঠাৎ হঠাৎ গায়ে মাথায় মুকুলের থেকে ফোঁটা হয়ে মধু ঝরে পড়ে। চারপাশের গাছপালাগুলো ডালপালা বাড়িয়ে তাকে সবার ধাক্কা আর ঠাট্টা থেকে আড়াল করে রাখে।

দেখতে দেখতে আমের মুকুল ঝরিয়ে এসে গেল চৈত্র মাস। গাঁয়ের অনেকে মন্দিরে গিয়ে এই মাসটার জন্যে সন্ন্যাস নিল। গলায় গাছি করে সুতোর মালা পরিয়ে দিয়ে পুরোত মশায় তার পর কারও হাতে তুলে দিলেন ত্রিশূল, কারও হাতে চিমটে। এখন থেকে এদের নাম হলো ভক্ত্যা। সারাদিন বাড়ি বাড়ি গিয়ে হাঁক দেয়, 'বাবা তারকনাথের চরণে সেবা লাগে,' বাড়িবাড়ি ভিক্ষে করে সূর্যাস্তে ফিরে এসে এক বেলা হবিষ্যান্ন রেঁধে ভোজন।

মাস পুরলে সংক্রান্তি। তখন পদ্মপুকুরের মাঠে বসবে চড়কের মেলা। এখান থেকে পদ্মপুকুর অনেকখানি পথ। গণেশ কোনও দিন যায়নি। এবার যাবে মা-ঠাকুমার সঙ্গে। ওরা বলে রেখেছে, নিয়ে যাবে গণেশকে। ছোটখাটো ফাইফরমাশের কত রকম কাজ থাকে।

চড়কে কত রকম কাণ্ডকারখানাই তো হয়। অনেক গল্প শুনেছে গণেশ। সারা বছর চড়ক গাছ পদ্মপুকুরের গভীর সমুদ্দুরে ঘুমিয়ে থাকেন। ভক্ত্যাদের ডাকাডাকিতে উঠে আসেন ডাঙাতে। তেল সিঁদুর হলুদ দিয়ে তাঁকে স্নান করাবে ভক্ত্যারা। পুজোতে সন্তুষ্ট হলে তিনি সোজা হয়ে দাঁড়াবেন চড়ক তলায়। ঢোল-ডগর কাঁসি-ঝাঁঝর বাজবে। ভক্ত্যারা নেচে নেচে জয়ধনি দেবে, 'জয় বাবা মহাদেব,' জয় ভোলা মহেশ্বর।'

সে যা কাণ্ড! না দেখলে বিশ্বাস হবে না। সেসব কাণ্ড দেখবার জন্যেও কপাল চাই, মহাদেবের কৃপা চাই। গণেশ রোজ মানত মানে, 'বাবা গো, দয়া করো, মা যেন বাবুদের বাড়ি থেকে ছুটি পায়, যেন চড়কের মেলায় দোকান দিতে পারে আর আমাকেও যেন সঙ্গে নিয়ে যায়। বাবা গো, দয়া করো। বোশেখ মাসে রোজ তোমাকে জল দেব।'

সংক্রান্তির ঠিক পাঁচ দিন আগে বাবুদের পুকুর ঘাটে পা পিছলে সেজো মা কোমরে চোট পেলেন। কী হয়েছে বোঝা যাচ্ছে না। নড়তে চড়তে দারুণ যন্ত্রণা। কিন্তু এখন চার দিন কিছু করা যাবে না, যা করার সংক্রান্তির পরে।

এমন অবস্থাতে গণেশের মায়ের ছুটি পাওয়ার কথা-ই ওঠে না।

সব কথা মায়ের মুখে শুনে গণেশের মুখ চুন হয়ে গেল। দূরের কোণে গিয়ে দু'হাঁটুর মধ্যে মুখ লুকিয়ে বসল। তবু বুক ঠেলে উঠে আসা কান্না লুকোতে পারল না। এতদিনের এত সাধ, এত স্বপ্ন সব বাবুদের পুকুর পাড়ে ভেঙে খান খান হয়ে গেল।

ঠিক আছে, গণেশও দেখে নেবে! বোশেখ মাসে তেষ্টায় যখন ছাতি ফেটে যাবে মহাদেবের, তখন কে জল দেবে বাবাকে! ভাবতে গিয়ে বুক ভেঙে কান্না ছড়িয়ে গেল সারা শরীরে।

ঠাকুমা ব্যস্ত হয়ে পড়ল। 'কী হয়েছে? ও গোণশু, কী হয়েছে মানিক আমার? কাঁদছিস কেন?'

কিন্তু মা ঠিক বুঝল, কোনখানে লেগেছে গণেশের। ছেলেকে কোলে নিয়ে বলল,'কোমর ভাঙলে তুই নিবি আমায় কোলে?'

মায়ের কোল থেকে নেমে পড়ার জন্যে গণেশ ছটপট করতে লাগল।

মা আবার বলল, 'ব্যস, ব্যস—ঢের হয়েছে। তোকে একটা টাকা দেব—তুই যাস মেলাতে। কী রে? পারবি তো একা একা যেতে?'

পারবে না মানে? খুব পারবে। গণেশ কি আর সেই ছোট্ট গণেশটি আছে নাকি?

বেলা থাকতে থাকতে ঠাকুমা নাতিকে খাইয়ে দাইয়ে রওনা করে দিল। মনে করিয়ে দিল, 'মায়ের সঙ্গে দেখা করে যাস।'

মাকে পেল বাবুদের পুকুর ঘাটে। একরাশ কাপড় কাচছিল। গণেশকে দেখে তড়িঘড়ি উঠে এল, বুকে জড়িয়ে মাথায় চুমু খেয়ে বলল, 'সাবধানে যাবি, সাবধানে আসবি, গাছের মাথায় রোদ থাকতে থাকতে রওনা দিবি—অনেকখানি পথ। টাকাটা নিয়েছিস তো!'

প্যান্টের পকেট থেকে টাকাটা বার করে দেখাল গণেশ।

মা বলল, 'ব্যাস, ব্যাস—পকেটে রাখ—পড়ে-টড়ে যায় না যেন। যা-তা খাস না। যা খরচ করবি, ভেবেচিন্তে খরচ করবি।'

গণেশ মাথা হেলিয়ে বলল, 'তুমি কিছু ভেবো না, মা।'

'আচ্ছা, ভাবব না—আয়.' বলে ছেলেকে এই প্রথম এতদূরের পথে একা যেতে দিয়ে মনে মনে ডাকল, দুর্গা, দুর্গা।'

গণেশ বুক ফুলিয়ে একা একা চলল। কত বড়ো হয়ে গেছে! খুব পারবে একা যেতে। আর যা কিনবে, খুব ভেবেচিন্তে কিনবে। ঠাকুমা অবাক হয়ে যাবে। তার আদরের গোণশু মেলা থেকে একা একা ঘরে এল!

কিছুটা এগিয়ে মেলার পথে আরও লোক পেল। যত পথ চলে ততই পথে লোকের ভিড় বাড়তে থাকে। ভিড় দেখে গণেশের ভয় ভয় করতে লাগল। কিন্তু আর তো ফিরে যাওয়া যায় না। দুরুদুরু বুকে সে এগিয়ে চলল। এবার দূর থেকে ঢোল-ডগরের আওয়াজ ভেসে আসতে লাগল। তার মানে মেলার কাছাকাছি এসে গেছে।

মেলায় পৌঁছে গণেশের তো চক্ষুঃস্থির। এত ভিড়? এর মধ্যে সে তো হারিয়েই যাবে। সবাই চলছে বাজনার শব্দের দিকে। চড়ক গাছের মাথায় উঠে ভক্ত্যারা বোঁ বোঁ করে ঘুরছে আর কোঁচড় থেকে বাতাসা-কদমার সঙ্গে সপেদা পেয়ারা ডাব নানারকম ফল-ফুল প্রসাদ ছুঁড়ে ছুঁড়ে দিচ্ছে আর চারপাশের ভিড় প্রচণ্ড হুটোপাটি করে সেই প্রসাদ ধরে নিচ্ছে।

অত ধাক্কাধাক্কির মধ্যে গণেশ একদম চ্যাপ্টা হয়ে যাবে। বেশি ভিড় ওই চড়ক গাছ ঘিরে। ওদিকে না গিয়ে গণেশ মেলার দোকানপাট গলিতে গলিতে ঘুরে দেখে বেড়াতে লাগল।

কত রংবেরঙের বেলুন, কত রকম খেলনা! এক দিকে সারি সারি ম্যাজিক-সার্কাসের তাঁবু। নাগরদোলা, খেলনা ট্রেন, বিশাল চাকায় ঝোলানো কাঠের ঘোড়দৌড়। বন্দুক দিয়ে বেলুনের নিশানা। ঘুরতে ঘুরতে গণেশ এসে পড়ল খাবারের দোকানগুলোর দিকে। কিন্তু মা যা-তা খেতে বারণ করে দিয়েছে। গণেশ আবার খেলনার দোকানগুলোর দিকে এলো। একটা দোতলা বাস গাড়ি দেখে খুব পছন্দ হলো। এতে সবাই চড়তে পারবে। সবার চড়ার জন্যেই তো বাস গাড়ি। কত দাম এটার? দোকানী দাম না বলে ওর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অনেক দাম।' গণেশ ক্ষীণ স্বরে আবার শুধোল, 'কত?'

দোকানী বলল, 'পঁচিশ টাকা।'

বাস রে! গণেশ সরে এলো দোকানটার

সামনে থেকে।

গণেশ আবার মেলায় ঘুরতে লাগল। এক খাবারের দোকানী ডিম ভেঙে একটা বাটিতে ঢালছে, তাতে পেয়াঁজ-কুচি লঙ্কা-কুচি দিয়ে চামচ দিয়ে জোরসে ঘুঁটে দিচ্ছে ফ্যাটফ্যাট করে, তারপর হাতলওয়ালা একটা তাওয়াতে ছ্যাঁক করে মশলাটা চালছে আর মশলাটা একটা পরোটার মতো হয়ে যাচ্ছে, লোকেরা খুব তারিয়ে তারিয়ে খাচ্ছে। তাই দেখতে লাগল গণেশ।

খানিকক্ষণ পরে দোকানী তাকাল গণেশের দিকে। 'কী চাই?'

গণেশ বলল, 'কিছু না।' কিন্তু সেখান থেকে সরেও গেল না। ডিমের পরোটা যা-তা জিনিস না। অনেক শুনেছে ডিমের গুণের কথা, তবে কখনও সে খায়নি। একটা খেয়ে দেখলে কেমন হয়?

দোকানীকে একজন খদ্দের এসে জিজ্ঞেস করল, 'মামলেট কত?'

দোকানী বলল, 'একটা ডিমের দেড়টাকা, ডবল ডিমের আড়াই টাকা।'

গণেশ ভেবেছিল, চার আনাতে কি আট আনাতে হলে একটা খেতে পারে। দাম শুনে চিত্তির।

গণেশ এবার এলো বাসন-কোসনের দোকান-গুলোর দিকে। কাঁসা পেতল, অ্যালুমনিয়ম, স্টেনলেস স্টিলের দোকান। বাঁটি, কাটারি, ছুরি, কাঁচি, সাড়াঁশি, তাওয়া-চাটু-কড়াইয়ের দোকান। খদ্দেরদের ভিড় আর ঠেলাঠেলি।

গণেশও তো একজন খদ্দের, তার পকেটে আছে মায়ের দেওয়া নগদ একটা টাকা। মা বলে দিয়েছে, খুব ভেবে চিন্তে খরচ করতে।

একটা থালা কিনলে হয়। এমন থালা যাতে খাওয়াও যাবে, মুখে দেখাও যাবে। কী চকচকে ঝকঝকে। 'কত দাম?' ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল।

দোকানী তার দিকে তাকিয়েই খেঁকিয়ে উঠল, 'স্টেনলেস স্টিলের দাম জিজ্ঞেস করতে এসেছে। ভাগ, ভাগ, বেটা চোর।'

গণেশ মেলা থেকে বেরিয়ে এলো। এদিকটায় ভিড় কম। থুবড়ে ওধার পড়ে আছে কয়েকটা গোরুগাড়ি, ছড়ানো খড় আর জোড়ে বাঁধা বলদ। অল্প কিছু লোকজনের জটলা এখানে ওখানে। তেঁতুল গাছের নিচে একজন বুড়ো বসে আছে, সামনে মাটিতে পাতা একটা ছেঁড়া গামছার উপর তার কালো লোহার সওদা সাজিয়ে বসে আছে—চিমটে, সাঁড়াশি, কাটারি, বঁটির ফলা, খুরপি, গজাল এই সমস্ত। বুড়োটা মিছিমিছি বসে একা একা বিড়ি টানছে। কাছে পিঠে খদ্দেরের কোনও চিহ্ন নেই।

গণেশ এদিক ওদিক তাকিয়ে সাহস করে এগিয়ে গেল। তাকে দেখে বুড়োর চোখে মুখে একটা উদাস ভাব জাগল। গণেশ জিজ্ঞেস করল 'ওই চিমটেটা কত?'

'এটা?' বুড়ো ছেঁড়া গামছার উপর পড়ে থাকা চিমটে দুটোর দিকে আঙুল দেখাল, 'এটা—আচ্ছা, এটা তিন টাকা।'

'এক টাকায় হবে?' গণেশ জানতে চাইল।

'না।' বুড়ো মেলার ভিড়ের দিকে তাকাল।

গণেশ অনুনয় করল, 'দাও-না এক টাকায়।'

'না!' বুড়োর উত্তরে বিরক্তি।

গণেশ ফিরে গেল মেলায়। এবার ভিড়ের মধ্যে গ্রামের অমল আর কৃষ্ণর সঙ্গে দেখা। দু-জনেই গণেশের চেয়ে দু'ক্লাস উঁচুতে পড়ে।

কৃষ্ণ জিজ্ঞেস করল, 'কী রে, গণশা, একলা কেন? হারিয়ে গেছিস নাকি?'

গণেশ বুক ফুলিয়ে বলল, 'না। আমি একলাই এসেছি।'

'দেখিস—হারিয়ে যাসনি যেন—মেলায় অনেক ছেলেধরা ঘোরে', বলে তারা আবার ভিড়ের মধ্যে মিশে গেল।

গণেশ বেরিয়ে এলো মেলা থেকে। সামনে সেই তেঁতুল গাছ, সেই বুড়ো সেখানটাতে তেমনই বসে আছে। গণেশ সোজা এগিয়ে গিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'ওই চিমটেটা এক টাকায় দেবে?'

বুড়ো বলল, 'যেটাই নাও, তিন টাকা।

আচ্ছা, তুমি দু'টাকা দাও।'

'না, এক টাকা।'

'আবার বলে এক টাকা? জানো, ফাল্গুন মাসেও তিন টাকা করে এক একটা বিক্‌কিরি করেছি?' আর একটা বিড়ি ধরিয়ে খোঁচাখোঁচা দাড়িওয়ালা বুড়োটা বলল, 'তখন অবিশ্যি সবাই সন্ন্যাস নেবার জন্যে চিমটে কিনছিল।'

গণেশ বলল, 'আমি সন্ন্যাস নেব না।'

'সে জানি বলেই তো দু'টাকা চাইছি।'

'না, এক টাকা।'

'তাহলে যাও, দ্যাখো, কোথায় এক টাকায় এরকম চিমটে পাওয়া যায়।' একটু চুপ করে থেকে বুড়ো আবার বলল, 'ছটা তিরশূল, ছ'টা চিমটে গড়েছিলাম—তার থেকে শুধু এই দুটো পড়ে আছে। ঠিক আছে, দেড় টাকায় নেবে তো নাও।'

গণেশ দেখল, এখানে দাঁড়িয়ে থেকে লাভ নেই। শস্তায় চিমটের খোঁজে সে আবার মেলায় ফিরে এলো। মা বলেছে, ভেবেচিন্তে খরচ করতে। এক টাকা দিয়ে তাকে চিমটেই কিনতে হবে।

ওদিকে চড়ক গাছ ঘিরে ঢোলডগর বাজছে। এদিকে একটা জোরালো মাইকে মেলা কমিটির ঘোষণা বাজছে। আবার সার্কাস-ম্যাজিকের তাঁবুগুলোতে নিচু পর্দার মাইকে খদ্দের ডাকাডাকি চলছে। অনেক দোকানের ব্যাপারী খালি গলাতেই চিৎকার করে চলেছে, এদিকে আসুন এদিকে আসুন, ফুরিয়ে গেলে আর পাবেন না। কান ঝালাপালা আওয়াজে আওয়াজে।

এক জায়গায় একটা ছোট জটলা, যেতে যেতে সবাই উঁকি দিয়ে দেখছে, কেউ চলে যাচ্ছে, কেউ দাঁড়িয়ে পড়ছে। গণেশ ঠেলেঠুলে ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। ঘোমটা ঢাকা একটি বৌ, কালো কালো হাতে সোনার চুড়ির ফাঁকে সাদা শাঁখা, মুখ লুকিয়ে কাঁদছে বোধহয়—তার বাড়ির লোকজন হারিয়ে গেছে।

পাছে সে-ও হারিয়ে যায় তাই গণেশ আবার বেরিয়ে এলো মেলার ভিড় থেকে। সামনে সেই তেঁতুল গাছ, নিচে সেই বুড়ো। তেমনই একা চুপচাপ বসে আছে, যেন সে-ও হারিয়ে গেছে,

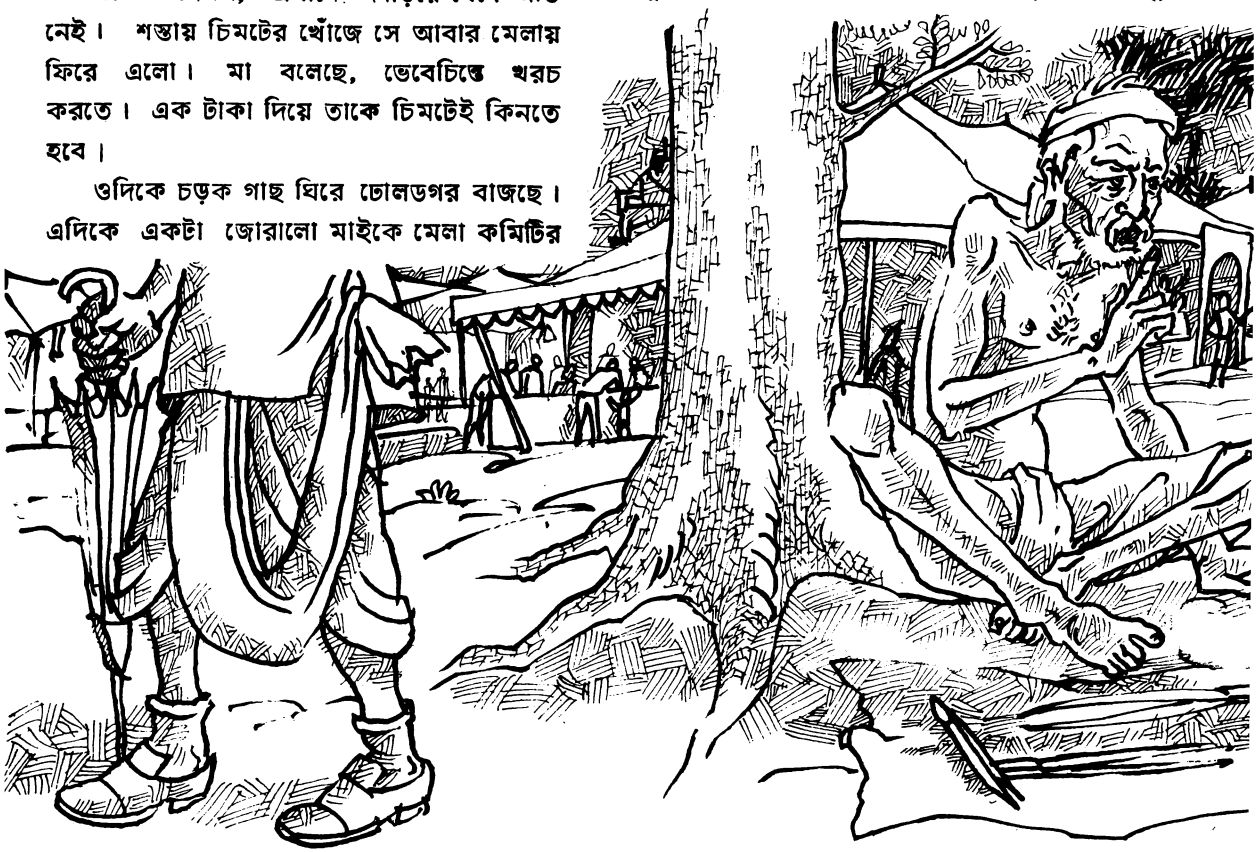

চোখে জল নেই এটুকুই যা তফাৎ। গুটিগুটি পায়ে গণেশ এসে দাঁড়াল বুড়োর সামনে, এসে বুড়োর নজরের নাগালে সে-ও চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকল।

তাকে দেখতে পেয়ে বুড়ো এবার একটু হাসল। কিন্তু কিছু বলল না। গণেশের দিকে তাকিয়ে চুপ করে মিটিমিটি হাসতে লাগল।

বুড়োর হাসিতে সাহস পেয়ে গণেশ কাছে গিয়ে দাঁড়াল।

'আবার এসেছিস? তোর মতলবখানা কী বল তো?' হেসেই জিজ্ঞেস করল বুড়ো।

গণেশ মুখে কিছু না বলে হাত দিয়ে চিমটের দিকে আঙুল দেখাল।

বুড়ো আবার হেসে বলল, 'বললাম তো, দেড়টা টাকা ফেলে দিয়ে নিয়ে যাও।'

গণেশ জিজ্ঞেস করল, 'এক টাকায়?'

কী ভেবে নিয়ে বুড়ো জিজ্ঞেস করল, 'তখন থেকে খালি এক টাকা এক টাকা! আর পয়সা নেই?'

শেষ পর্যন্ত এক টাকাতেই চিমটেটা কিনে ঝাণ্ডার মতো কাঁধে তুলে গণেশ বাড়ির পথে পা চালাল। জোরে জোরেই পা চালাল—কিছুটা গর্বে, কিছুটা ভয়ে। কখন যে গাছপালার মাথা থেকে রোদ্দুর সরে গেছে, খেয়াল করেনি। অন্ধকার ঘনাতে শুরু করেছে অচেনা পৃথিবীতে, চেনা আকাশে একটি-দুটি করে তারা ফুটতে শুরু করেছে।

ওদিকে মা একবার বাবুদের বাড়ি একবার নিজের বাড়ি যাওয়া-আসা করছিল। এখনও কেন এলো না ছেলেটা? কোনও বিপদ-আপদ হয়নি তো? বাবুদের বাড়ির কাজ এখনও শেষ হয়নি। ছেলেটাকে যে খুঁজতে যাবে তারও জো নেই।

শাশুড়ী সান্ত্বনা দিল। 'এতটুকুন ছেলে! ওর কি অত সময় জ্ঞান আছে যে ঠিক সময়ে মেলা থেকে রওনা দেবে?'

'সময় জ্ঞান নেই, এদিকে মেলায় যাওয়ার শখ আছে ষোলো আনা!' বড়ো বড়ো পা ফেলে গণেশের মা ফিরে চলল বাবুদের বাড়িতে বাকি কাজ সারতে।

ফিরতি পথে গণেশের সঙ্গে দেখা। কাঁধ থেকে চিমটে নামিয়ে হাতে নিয়ে হনহন করে গণেশ তখন বাড়ি আসছে।

ছেলের হাতে চিমটে দেখেই মায়ের পা থেকে মাথা পর্যন্ত জ্বলে গেল। একজন চিমটে হাতে নিয়ে ঘর ছাড়লেন। এখন আবার ইনিও বাপের পথ ধরেছেন। বাপে বেটায় তার জীবনটাকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খাক করে দিল। প্রথমেই দু'ঘা,

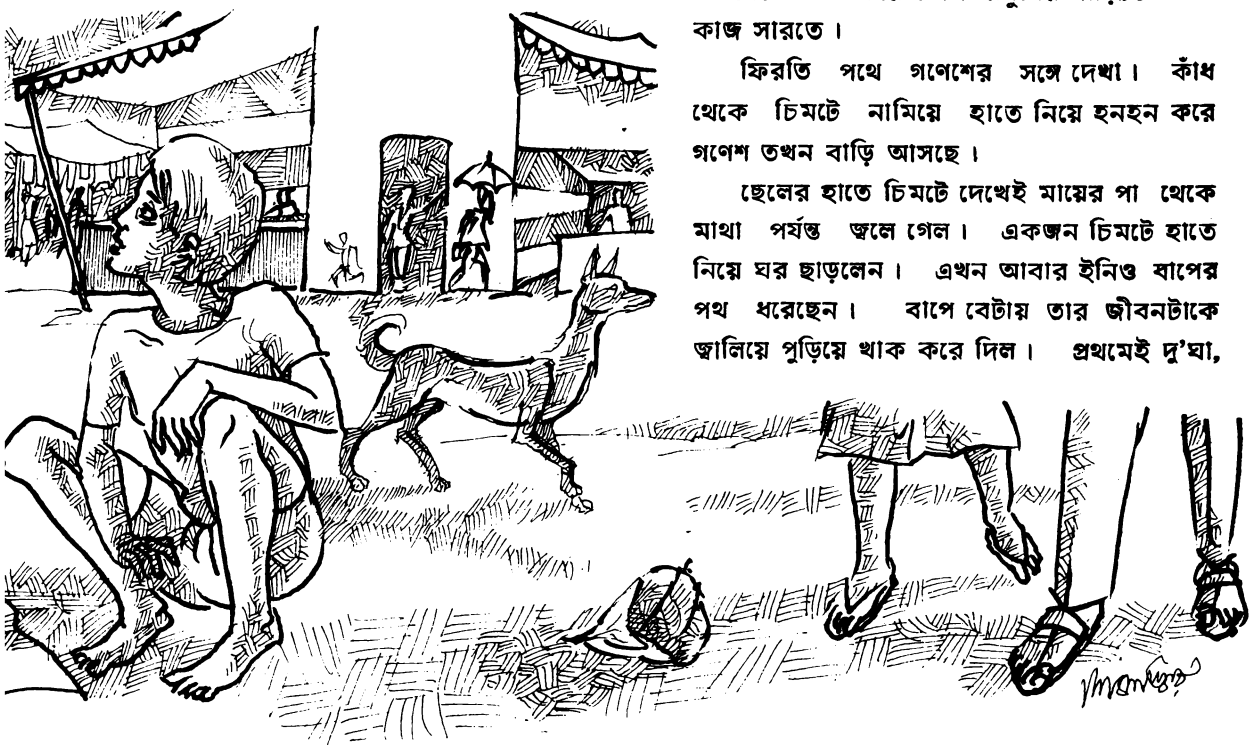

তারপর কান ধরে হিড়হিড় করে বাড়ি টেনে এনে গণেশকে এক ঝটকাতে ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বাইরে থেকে শিকল তুলে দিল।

শাশুড়ী তো থ।

গণেশের মা যেমন ঝড়ের বেগে এসেছিল, তেমনই ঝড়ের মতো চলে গেল।

বাবুদের বাড়িতে কাজকর্ম সেরে বাড়ি এসে গণেশের মা দাওয়ার খুঁটিতে ক্লান্ত দেহটা এলিয়ে দিয়ে আঁচলে মুখ-গলা মুছে জিজ্ঞেস করল, 'ছোঁড়াটা কোথায় ?'

ক্ষীণভাবে ঠাকুমা বলল, 'তখন থেকে তো ঘরেই আটকা আছে।'

'খুলে দাওনি কেন ?'

এ যে উল্টো চোপা। ঠাকুমা চুপ করে থাকল।

শিকল নামিয়ে ধাক্কা দিয়ে মা দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঘুটঘুটে অন্ধকার। ভেতরে পা রেখে মা ডাকল, 'গণেশ।'

সাড়া নেই।

'গণেশ', মা আবার ডাকল।

সাড়া নেই।

ঠাকুমা বলল, 'ঘুমিয়ে পড়েছে বোধহয়।'

মা টেমিটা জ্বেলে এনে দেখল, গণেশ সত্যিই ঘুমিয়ে পড়েছে।

ঠাকুমা বলল, 'আহা বাছা না খেয়েই ঘুমিয়ে পড়ল গা।'

'অতই যদি দরদ, দুটো বানিয়ে দাওনি কেন ?' তারপর নিজের মনেই গজগজ করতে লাগল, 'আগের জন্মে কী পাপ করেছিলাম কে জানে! যেমন বাপ তেমনই বেটা। সানাইয়ের সঙ্গে পোঁ আছে। কী আমার শাশুড়ী ভাগ্য রে! এমন সুখের কপাল ক'টা মানুষের হয়।' গজগজ করতে করতে গণেশের মা গণেশের পাশেই শুয়ে পড়ল।

তখন বেচারী বুড়ী টেমিটা নিয়ে গিয়ে কাঠ-কুটো যোগাড় করে উনুন ধরাতে বসল। সারাদিন খেটেখুটে মায়ের গতর না দিলে ঠাকুমাকেই ব্যবস্থা করতে হবে। অতটুকুন ছেলেকে তো আর উপোসে ফেলে রাখা যায় না।

গণেশের মা উঠে এসে দাঁড়াল ঘরের দরজাতে। 'এততেও শান্তি নেই ? এখন কাপড় চোপড়ে আগুন ধরিয়ে পুড়ে মরার তাল ? আমাকে ফাঁসিতে না ঝুলিয়ে সুখ হচ্ছে না তোমার ?' শাশুড়ীকে তুলে দিয়ে মা বসল উনুন ধরাতে।

কিছুক্ষণ কারও মুখে কথা নেই। দূরে কোথায় শেষ বসন্তের পাপিয়া হা হা করে ডেকে ডেকে সারা হচ্ছে। উনুনে কাঠ জ্বলছে দাউদাউ করে। আর মা রুটি বানাচ্ছে হাতের পাতায় সাট সাট আওয়াজ করে।

'এবার ডাকো তোমার নাতসাহেবকে—খেয়ে উদ্ধার করুক,' বলে মা হাতে হাতে বেলা কাঁচা চাপাটি ছুঁড়ে দেয় উনুনে।

ডাকার আগেই গণেশ এসে দাঁড়াল দপদপে আগুনের আলোতে। তার হাতে মেলা থেকে কিনে আনা সেই চিমটে। আগুনের দিকে মুখ করে বসার জন্যে পেছন থেকে গণেশের আসাটা বুঝতে পারেনি। গণেশ চিমটেটা এগিয়ে দিল মায়ের দিকে নিঃশব্দে। মা খেয়াল করছে না দেখে মুখে আওয়াজ দিল, 'মা, এই যে—'

পেছনে গণেশ এসে দাঁড়িয়েছে বুঝতে পেরে মা বলল, 'বসে পড়—গরম গরম দিচ্ছি—'

গণেশ চিমটেটা আরও এগিয়ে দিল মায়ের দিকে।

'এটা কী ?' বলে মা বিরক্ত হয়ে চিমটেটা ঠেলে দিল।

তখন গণেশ বলল, 'নাও-না, এটা দিয়ে রুটি সেঁকো।'

এবার মা ফিরে তাকাল গণেশের দিকে।

'রোজ আঙুলে ছ্যাঁকা খেয়ে রুটি স্যাঁকো—' কথাটা শেষ করতে পারল না গণেশ।

মা জড়ানোভাবে বলল, 'আমার আঙুলে ছ্যাঁকা লাগবে না বলে ?'

গণেশ মায়ের হাতে চিমটেটা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তাই নিয়ে এলাম।'

তারপর মা গণেশকে জড়িয়ে ধরে আর গণেশ মাকে জড়িয়ে ধরে দুজনে দুজনকে জড়িয়ে হু হু করে কাঁদতে লাগল।

ময়না-তদন্ত

ভবানীপ্রসাদ মজুমদার

শালিক-পাখির তিনটি-ছানা হঠাৎ হলো হাওয়া
সারাটি দিন খুঁজেও তাকে গেলই না আর পাওয়া !
শালিক-মা তো নাওয়া-খাওয়া ভুলে কেঁদেই সারা
শোকের ছায়া নামল, দুখে স্তব্ধ পাখির পাড়া ।

সবাই মিলেই বললে তখন, 'ময়না-দি'কে শুধাও
তিন-তিনটি শালিক-ছানা কোথায় হলো উধাও ?
ময়না-দি খুব চালাক চতুর, 'পক্ষীকুলের পুলিশ'
তার কাছে সব হার মেনে যায়, সবাই সাজে ফুলিশ্ !

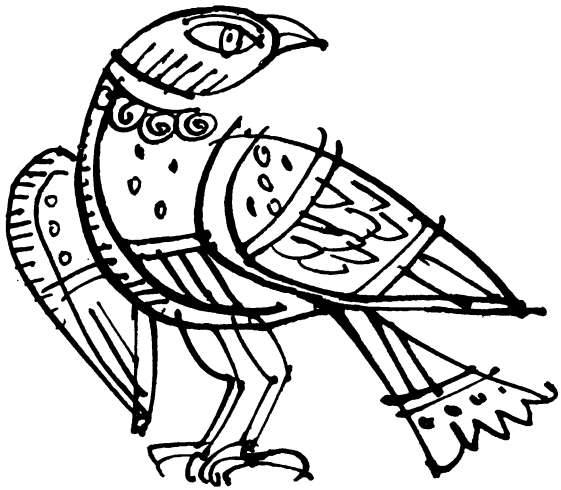

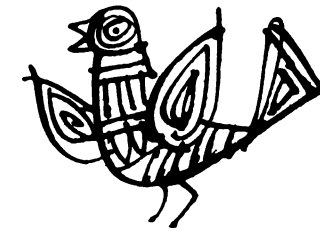

গয়না-পরা ময়না-দিদি কয়না কথা বাজে —
রাত্রি জেগে গেলেন লেগে শাবক-খোঁজার কাজে ।
তিন-দিন পর দিলেন খবর ক্লান্ত হয়ে এসেই
ছানারা খুব সুখেই আছে, খেলছে গেয়ে হেসেই…

কোথায় আছে ? সবাই শোনো, নেইতো বনের গাছে
পাখির ছানা খাচ্ছে 'খানা' মানুষ-ছানার কাছে !
ওদের নিয়ে পালিয়ে গেছে বদনপুরের মদন তো ··
বললে সবাই, সাবাস্-সাবাস্, ধন্য 'ময়না-তদন্ত !!'

কালাচাঁদ বনাম পাগলা দাশু

কালাচাঁদ কতগুলো ছবি এঁকেছিল ; পাগলা দাশুর সেগুলো ভারি পছন্দ ! ঝটপট সেগুলো নকল করে নিল ও। একেবারে হুবহু নকল ! কিন্তু প্রোফেসর নিধিরাম পাটকেলকে দেখাতেই উনি বললেন, 'এ কিহে ! এক একটা ছবিতে অনেকগুলো করে ভুল !' দাশু দেখল ভাল করে, —তাইতো !

একটা ছবি আমরা ছাপলাম। বাঁদিকেরটা কালাচাঁদের আঁকা, ডান দিকেরটা দাশুর। বলতে পারো, ভুলগুলো কী কী ?

কালাচাঁদ বলল 'ঝুলতে কাহার খোর ফুরি।'
প্রোফেসর উত্তর দিলেন 'দুরি ভাজার দাম।'

কে কি বলল, বুঝলে কি ?

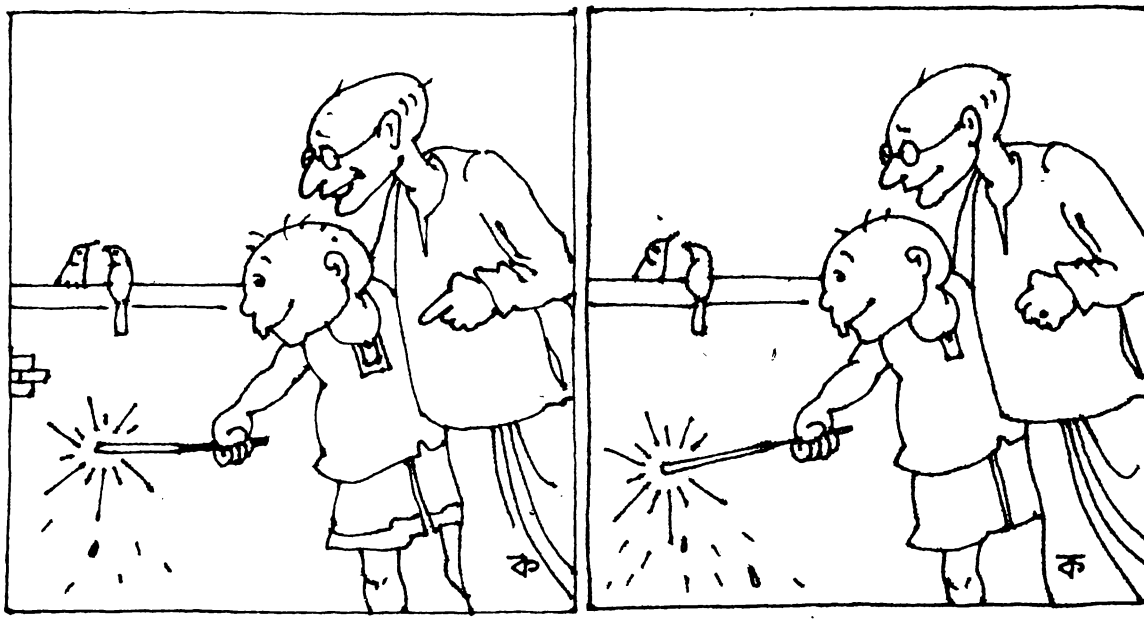

না পারলে ৮৭৮ পৃষ্ঠা দেখ।

কণিয়া

সলিল চট্টোপাধ্যায়

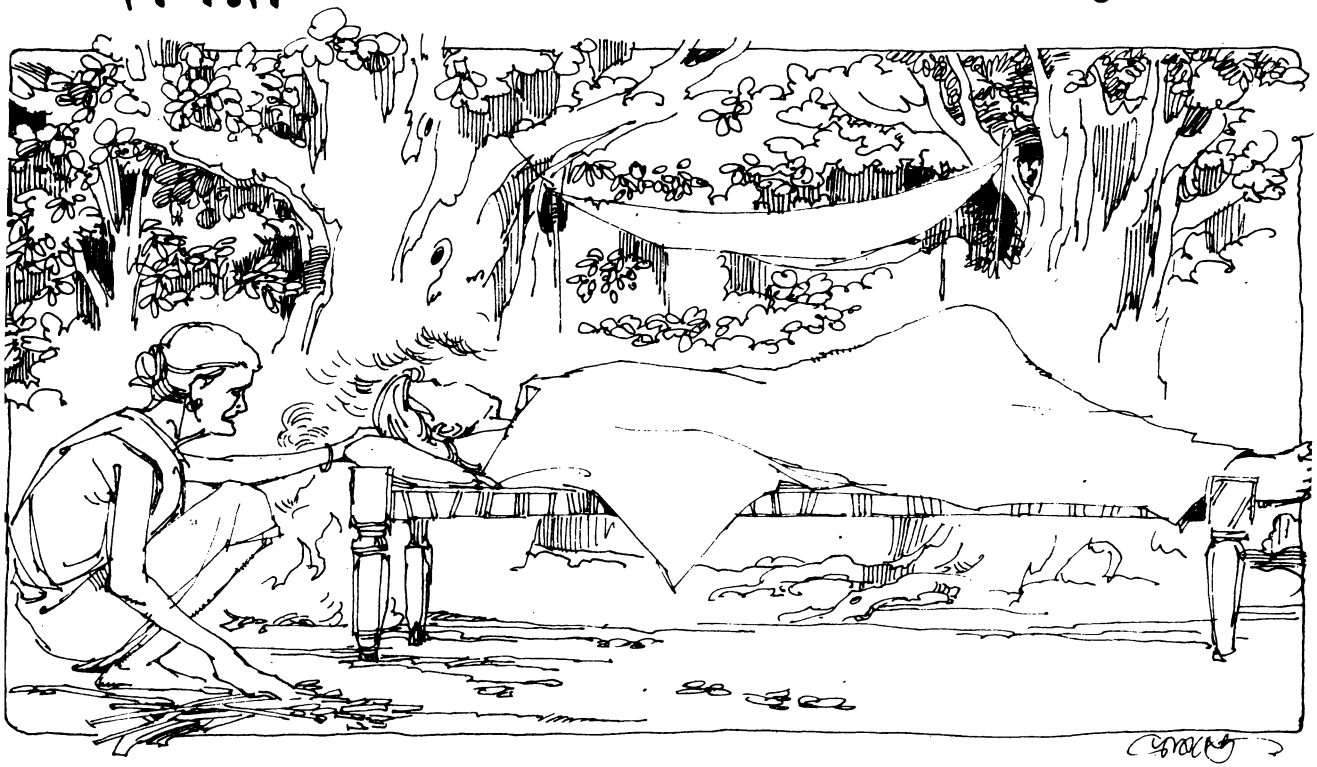

বসিয়াপাড়া রিজার্ভ ফরেস্ট থেকে সম্বলপুরের দিকে আসতে পথের বাঁ ধারে ডুমেরচুয়াঁ গুঞ্জাঘোরার বন। এক সময়ে এ বনে অনেক ভালুক ছিল, ডোরাকাটা বাঘও ছিল। ডুমেরচুয়াঁ এবং গুঞ্জাঘোরা আসলে দুটো পাশাপাশি পাহাড়—ভাঙাচোরা রাশি রাশি কালো কালো পাথরের চাঁই—তারমধ্যে নানা রকম ছোট বড় গাছ। চৈত্র বৈশাখে রাশি রাশি কুরচি ফুলে এ বন পাহাড় ভরে যায়।

এ জংগলে কেন্দুপাতার গাছও প্রচুর। কেন্দু-পাতা দিয়ে বিড়ি তৈরি হয়। বিড়ি ব্যবসায়ীরা তাই বিড়িপাতা বা কেন্দুপাতা কেনে। এই পাতা বা স্থানীয় ভাষায় 'পতর্'কে ঘিরে এখানে অসংখ্য সাধারণ মানুষের জীবিকা গড়ে উঠেছে। আমাদের দেশে সবচেয়ে যে ভাল বিড়িপাতা এই এলাকাতেই পাওয়া যায়। বসন্তকালে গ্রামের লোকেরা জংগলে ঘুরে সব কেন্দুগাছের ডাল ছেঁটে দেয়—একে ওরা বলে 'ছপি' দেওয়া। ফলে বৈশাখে নূতন কচি পাতা লম্বা লম্বা হয়ে বেরুতে থাকে। এই পাতাই সবচেয়ে ভাল। একটু বৃষ্টি হলেই কেন্দুপাতার রোঁয়া হয়ে যায়। সে পাতার দাম খুব কম। তাই পাতা সংগ্রহের সময়টাই হল এপ্রিল থেকে জুন—মানে যখন এখানে প্রচণ্ড গরম।

আগে এইসব জংগলে বিড়ি পাতা কেনার স্বত্ব ওড়িশা সরকারের বনবিভাগ থেকে নিলাম করা হত। বড় বড় ব্যবসায়ীরা লোকজন গাড়িঘোড়া নিয়ে নেমে পড়ত এই পাতা সংগ্রহের কাজে। বনের বিভিন্ন যায়গায় পাতা সংগ্রহের জন্য খোলা হয় 'ফড়ি' (ফাঁড়ি)। এই সব ফড়িতে কাঁচা পাতার 'কেড়ি' (বাণ্ডিল) কিনে রোদে শুকিয়ে বস্তা ভর্তি করে ট্রাকে ট্রাকে নিয়ে যাওয়া হয় গুদামে।

বসিয়াপাড়া ডুমেরচুয়াঁ অঞ্চলে এরকম অসংখ্য কেন্দুপাতার 'ফড়ি' বসতো আর সেই সূত্রেই ওই এলাকায় আমার যাওয়া।

বসিয়াপাড়া রিজার্ভ ফরেস্ট এলাকায় যতদূর মনে পড়ছে একটা পাহাড়ি নদীও এঁকেবেঁকে মহানদীতে গিয়ে পড়েছে। চৈত্র বৈশাখের গরমে এ নদীতে জল প্রায় থাকে না। এ নদীর ওপরেই

ছিল একটা বড় 'ফড়ি।' সারাদিন পাতা তুলে বিকেল হতেই দলে দলে বাচ্চা, মেয়ে, বুড়িরা আসে 'ফড়ি'তে পাতা বিক্রি করতে। প্রত্যেকের পাতা গুনে নিয়ে পয়সা তখনই দিয়ে দিতে হবে। রোজ তাই প্রচুর খুচরা পয়সার দরকার হয় এইসব 'ফড়ি'তে। ছোট বড় বস্তায় ভর্তি করে খুচরা পয়সা নিয়ে জীপে পৌঁছাতে যেতাম এইসব 'ফড়ি'তে। রোজকার কেনার হিসাবও দেখতাম।

তখন হীরাকুঁদ বাঁধ তৈরি হয়ে গেছে। তার বিশাল জলাধার এ এলাকার পাথুরে রুক্ষ বন-ভূমির প্রচণ্ড তাপমাত্রায় একটা ভ্যাপসা গরমের ভাব এনে দিয়েছিল। তাপমাত্রা প্রায়ই শুনতাম ১১৬° ফারেন হাইট ছাড়িয়ে গেছে। খুব ভোরে ভাতে জল ঢেলে নুন লেবু মিশিয়ে পেট ভরে খেয়ে, চোখে গগলস, ফুলহাতা শার্ট পরে মোটা তোয়ালে দিয়ে নাক মুখ মাথা ভাল করে ঢেকে জীপে চড়ে বসতাম। না হলে প্রচণ্ড গরম হাওয়ায় গায়ের চামড়া ঝলসে যাওয়ার মত হয়ে যাবে। অনেকেরই সর্দিগর্মি হয়ে যেত। সারাদিন জংগলে পয়সা বিলিয়ে, পাতা কেনার তদারকি করে রাত ন'টা দশটায় ফিরতাম সম্বলপুর। কোন কোনদিন বেশি রাত হয়ে গেলে জংগলের ভেতরে কোন 'ফড়ি'তেই গাছের নিচে খাটিয়া পেতে সবার সংগে থেকে যেতাম।

ডুমেরচুয়াঁ পাহাড়ের গা ঘেঁষে ছিল মস্ত এক বাঁশের বন—তারপর শাল, অর্জুন, মহুয়ার বন এবং তারপরেই ছিল সেই বালিপাথুরে নদীটি। নদীর এপারে ডুমেরচুয়াঁ ওপারে বসিয়াপাড়া—দুই বন। নদীর উপরে এই বাঁশবনের কাছেই ছিল সেই বড় 'ফড়ি'। দুটো বনের পাতা আসতো এইখানে—রোজই অনেক টাকার পাতা কেনা হত। তাই বেশ কয়েকজনকে রাখা হয়েছিল এখানে। মাঝে মাঝে আমিও আটকে যেতাম রাতে—বোধহয় ইচ্ছা করেই। জায়গাটা আমার খুব ভাল লাগত—এমন সুন্দর বন—কুরচি ফুল, মহুয়ায় সাজানো। অবশ্য অন্যান্য দূরের 'ফড়ি'গুলো দেখে এখানে আসতে প্রায়ই সন্ধ্যা হয়ে যেত।

এখানকার 'ফড়ি'তে ছিল কয়েকটা ঘর—নদীর বালির ওপর শুকনো গাছের ডালপালা দিয়ে ঘেরা, তার ওপর ত্রিপল বা চট বিছান - দুপুরের রোদ ঠেকাবার জন্য। এগুলোতে থাকত 'ফড়ি'র কর্মচারীদের জিনিসপত্র, হিসাবের কাগজ খাতা আর খাটিয়া। রাতের বেলা এই খাটিয়াগুলো বাইরে এনে খোলা আকাশের নিচে সবাই মিলে শুয়ে থাকতাম। নদীর বালি সরিয়ে বার করা জল ছিল যেমন ঠাণ্ডা তেমনি মিষ্টি। একটা ঘরে বড় বড় জালায় ভরে রাখা হত সেই জল। 'ফড়ি'র লোকেরা ছাড়া গাঁয়ের লোকেরাও ওই জলই খেত। দিনে রান্নাবান্নার পাট ছিল না। এখানেও সবাই ভোরে জল দেওয়া ভাত, এখানে বলে 'পখার', তাই খেয়ে নিত। রান্না হত রাতে। নদীর ওপরই পাথর সাজিয়ে উনুন করা ছিল। সারাদিনের কাজের পর তাইতে রান্না হত ভাত, আলুসিদ্ধ, বুনো আলু, পতালঘণ্টের অর্থাৎ টম্যাটোর তরকারি, কখনো সখনো ডাল। মাঝে মাঝে আমি আচারের শিশি নিয়ে যেতাম। সবাই খুব মজা করে খেতো। তারপর নদীর বুকে খোলা আকাশের নিচে শুয়ে জোনাকি আর তারার নকশা দেখতে দেখতে ঘুম। একটু দূরেই জ্বলত একটা পেট্রোম্যাক্স—ভোর রাতে তেল ফুরিয়ে সেটাও আপনিই নিবে যেত।

যারা পাতা বিক্রি করতে আসত বেশির ভাগই ছোট ছেলে মেয়ে তাদের মা বা বড় কারোর সংগে ; আর আসতো বুড়িরা। এমনি এক বুড়ির সংগে আমার খুব ভাব হয়ে গিয়েছিল। সে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারত না, চামড়া কুঁচকে গাছের ছালের মত হয়ে গিয়েছিল। বুড়ি মজা করে আমাকে বলত 'ভইতা' মানে নাকি বর, আর ওকে বলতাম 'মোর কণিয়া'—আমার বউ। রোজ একগাদা কেরি বাঁধা পাতা—(পাতার ছোট ছোট আঁটিকে বলা হয় 'কেরি) ডালায় ভরে নিয়ে আসতো—সংগে আসতো দুই নাতনি ফুটফুটে দেখতে। নাম ছিল 'দিবা' আর 'রাতি'। ওরা মজা করে আমাকে ডাকতো 'অজা'—মানে

দাদু। এই দুই নাতনি ছাড়া 'কণিয়া'র আর কেউ ছিল না। খুব কষ্ট করে দিন চলত ওদের। তবু দেখতাম ওর তামাটে রঙের কোঁচকানো মুখের চামড়ায় একটা হাসি ধরাই ছিল।

অনেকদিন হিসাব শেষ করতে রাত হয়ে যেত। 'কণিয়া'র গাঁয়ের লোকেরা সবাই বসে থাকত একসংগে যাবে বলে। হিসাব হয়ে গেলে দলবেঁধে রওনা হত অন্ধকারের মধ্যে। ওদের গাঁ ছিল ডুমেরচূয়াঁ পার হয়ে অনেকটা, আমাদের ওই বাঁওশপাড়া ফড়ি থেকে প্রায় তিনচার মাইল। ওদের কাছেই শুনেছি রাতে ফিরে গিয়ে রান্না করে খাবে। তারপর ভাতে জল দেওয়া থাকবে। সকালে সেই 'পখাড়' খেয়ে আবার বেরিয়ে পড়বে সারাদিনের জন্য বনে।

মাঝে মাঝে টর্চ নিয়ে যেতাম 'কণিয়া'দের সংগে নদীর ওপর দিয়ে বাঁশবনের ধার পর্যন্ত—গল্প শুনতাম এই ডুমেরচূয়াঁর। এই পাহাড়ে নাকি থান আছে—সেখানে গভীর রাতে হঠাৎ হঠাৎই বিশাল আগুন জ্বলে ওঠে। তা আবার তেমনি হঠাৎই মিলিয়ে যায়। কখনো কখনো এ আগুনের রঙ হয় রক্তের মত লাল। তখনই সবাই বুঝে নেয় মহামারী হবে—কলেরা কি বসন্তে গ্রাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সব গ্রামের লোক তখন ডুমেরচূয়াঁয় উঠে ভোগ দেবে—অষ্টপ্রহর কীর্তন হবে।

রাতে কেউ একা ডুমেরচূয়াঁর পথে যায় না। পাহাড়ের ধারে শাদা কাপড় পরা একটা মেয়ে নাকি বসে থাকে। কাউকে একা পেলে তার হাত ধরে নিয়ে চলে যায়—সে নাকি কথাও বলতে পারে না আর ফিরেও আসে না। এমনি সব মজার গল্প শুনতাম।

সেদিন সকাল বেলা রাংগালী ফরেস্ট ঘুরে পূর্বদিক থেকে বসিয়াপাড়া ঢুকেছি। বনের মধ্যে এক যায়গায় দেখি বুনোকুল প্রচুর ফলে আছে। গাড়ি থামিয়ে ড্রাইভার মজিদকে নিয়ে প্রচুর কুল তুললাম বাঁওশপাড়া ফড়ির সবার জন্য। ঝুঁকে ঝুঁকে কুল তুলছি তখনই কি একটা পোকার মত ঘাড়ের কাছে কামড়ে দিল—আর সংগে সংগেই জ্বলুনি—এরকম যন্ত্রণা হতে লাগল যে ইচ্ছা হচ্ছিল চীৎকার করি। দেখতে দেখতেই ঘাড় গলা ফুলে ঢোল। মজিদ গেল ঘাবড়ে। সংগে টাকা বাঁওশপাড়া—ডুমের-চূয়াঁর পাশে সেই নদীর ওপর ফড়িটার জন্য—যেতেই হবে। অতএব ঐ অবস্থাতেই মজিদকে বললাম 'জলদি চল বাঁওশপাড়া।' গাড়িতেই প্রচণ্ড জ্বর চলে এল—চোখে অন্ধকার দেখছি। ফড়িতে জীপ পৌছতেই—কোনমতে নেমে টলতে টলতে এক ধারে রাখা একটা খাটিয়াতে ধপাস করে শুয়ে পড়লাম—একটা কথাও বলতে পারি নি।

তারপরের ঘটনা ড্রাইভার মজিদের কাছে শোনা। আমার অবস্থা দেখে ফড়ির সবাই খাটিয়ার চারপাশে ভিড় করে দাঁড়ায়। মহা চেচাঁমেচি শুরু হয়ে যায়। ওখানে 'ফড়ি'র দায়িত্বে ছিল 'বিসিকেশান'—মজিদ ও সে দুজনেই খুব ভয় পেয়ে যায়। ঠিক হয় তখনই সম্বলপুর নিয়ে যাওয়া হবে। 'কণিয়া' বসে-ছিল তার পাতার ডালা নিয়ে একপাশে—সেও উঠে এসেছিল হৈ চৈ দেখে। মাথার কাছে বসে ভাল করে দেখে ও নাকি বলে যে আমাকে 'বাণ' মারা হয়েছে তবে ও মন্ত্র পড়া ওষুধ করে ভাল করে দিতে পারবে। ওর কথা মজিদ সুদ্ধ মেনে নেয়। তারপর সুরু হয় 'কণিয়া'র বাণ তোলার মন্ত্র। আমার মাথার কাছে আগুন জ্বালিয়ে তাতে নানা রকম গাছের পাতা আর শেকড় পোড়াতে থাকে। এক ফাঁকে ডুমেরচূয়াঁর ওপর থেকে কি একটা গাছ এনে তার পাতা বেটে আগুনে গরম করে ঘাড়ে কপালে লেপে দেয় আর জোরে জোরে মন্ত্র পড়তে থাকে কোন অবোধ্য ভাষায়।

মাঝ রাতে আমার ঘুম ভেঙে যায়। প্রথমে খানিকক্ষণ মনে করতে পারিনি আমি কোথায় এবং কেন? চারপাশে একটা কটু ঝাঁজালো গন্ধ—কপালে ঘাড়ে চট্‌চটে কি লেগে আছে।

সব মনে পড়তেই অবাক হয়ে যাই - ঘাড়ে বা বা গলায় কোন যন্ত্রণাও নেই ফোলাও নেই। মাথার কাছে গণ্‌গণ্‌ করে একটা ধুনি জ্বলছে—তাতে গাছের ডাল পুড়ছে পট্‌পট্‌ করে। চারপাশে সবাই ঘুমোচ্ছে শুধু 'কণিয়া' বুড়ি মাটিতে বসে কিসব বলে যাচ্ছে—এপাশে মজিদ বসে বসে ঢুলছে। আমি ওর দিকে তাকাতে কণিয়া একটা পাতাঅলা ডাল আমার মুখের ওপর বোলাতে লাগল। প্রায় সংগে সংগে আমি আবার ঘুমিয়ে পড়ি।

পরদিন সকালে যখন ঘুম ভাঙল তখন আমি একদম ঠিক—গতদিনের কষ্টের কোন লেশ মাত্র নেই শরীরে। কণিয়াও নেই। মজিদ বালির ওপর কাত হয়ে ঘুমাচ্ছে। বিসিকেশন জানাল ভোর হতেই 'কণিয়া' চলে গেছে—বড় নাতনি 'রাতি' ছিল, তাকে সংগে নিয়ে। ফড়ির একজন কর্মী জানাল বুড়ি ওষুধ করতে হবে বলে রাতে কিছু খায়নি। বখসিস নেবার কথায় রেগে গিয়েছিল—তাতে নাকি ওষুধের গুণ নষ্ট হয়ে যায়। মুখ হাত ধুয়ে চা খেয়ে চলে আসি সম্বলপুর। গোটা ব্যাপারটা দুঃস্বপ্নের মতই মনে হয়।

এরপরে আর একবার মাত্র কণিয়াকে দেখেছিলাম ডুমেরচূয়াঁর পথে। আগের মতই ওর হাত ধরে ঠাট্টা করেছিলাম—কোথায় ছিলে এত দিন। সেও হেসে একটা মজার জবাব দিয়েছিলো। ঐ পর্যন্ত। আমি একটা ধুতি পাঠিয়ে ছিলাম, ওর জন্য—সেটা নেয়নি। শুধু বলেছিল ওর নাতনি দুটোর বিয়ের সময় সম্ভব হলে কিছু সাহায্য করতে।

এর কিছুদিনের মধ্যেই কাল-বৈশাখির ঝড় বৃষ্টি শুরু হয়ে যায়—আর তাই আমাদেরও তাড়াহুড়া করে জংগলের কাজ শেষ করে চলে আসতে হয়। আমি চলে যাই ভিলাইতে অন্য দায়িত্ব নিয়ে। কণিয়ার নাতনিদের বিয়ের কোন খোঁজ খবরও নিতে পারিনি।

---

৮৭৪ পৃষ্ঠার উত্তর—
কালাচাঁদ বলেছিল 'খোকার হাতের ফুলঝুরি'
প্রোফেসর—'দাদুর ভারি মজা!'

ডাইনে পাগলা দাশুর ছবিতে,

(১) পাঁচীলে বসা ডাইনের পাখীর চোখ নেই,
(২) পাঁচীলে ইঁট দেখা যাচ্ছেনা,
(৩) খোকার হাতের ফুলঝুরি একটু তলারদিকে বেঁকানো বা হেলান,
(৪) খোকার মাথার চুল কম,
(৫) খোকার জামার সামনের বোতামের জায়গা অন্যরকম,
(৬) প্যান্টালুন অন্যরকম,
(৭) খোকার বাঁ পা দেখা যাচ্ছেনা,
(৮) দাদুর মুখের হাসি কম, মুখ বোজানো,
(৯) দাদুর হাতে শুধুই মুঠো, তর্জনী দেখা যাচ্ছেনা,
(১০) পকেটের মুখ লম্বা,
(১১) কোঁচায় বেশী ভাঁজ,
(১২) কালাচাঁদের ছবির তলায় তার 'ক' সইটা ঠিক জায়গায় বসেনি

ন্যাড়া

হিজিবিজিবিজ

ন্যাড়া আর ন্যাড়ার ভাই..
দাদা, একটু বেড়িয়ে আসবে? অনেক দিন পরে দেশে ফিরে ঘরে ব'সে থাকতে ভাল লাগছেনা
নিশ্চয়
রাস্তায়
আরে! ন্যাড়া যে!
পাশের ছেলেটাকে ঠিক ন্যাড়ারই মতন দেখতে
ইনি তোমার দাদা বুঝি?
না - এ আমার ছোট ভাই
কিছুক্ষন পরে আর একজন
ন্যাড়া, দাদাকে নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছ বুঝি?
উঃ! এ মোটেই আমার দাদা নয়
না... মানে, প্রায় একই রকম দেখতে, ... তাই ভাবলাম.....
কি আপদ! এ আমার ছোট ভাই। — বুঝলেন? উঃ!
না হয় আমি ভাইএর চেয়ে একটু বেঁটে, তাব'লে সবাই ওকে দাদা বলবে? কি অপমান!
একটা ব্যবস্থা করতেই হচ্ছে। আইডিয়া....
পরেরদিন বিকালে রাস্তায়
বুকে পোস্টার লাগিয়ে নিয়েছি। এবারে আর কারো ভুল হ'বেনা
আমি দাদা.
!

রহস্যময় সিন্দুক

সুবীর গুপ্ত

ময়না বলে, পাঁচ বছরের
ছোট্ট বোন বিন্দুকে-
কেউ জানেনা কি যে আছে
দিদিমার ঐ সিন্দুকে।
হয়তো আছে গয়নাগাঁটি
কিম্বা মোহর আকবরী—
নয়তো দিদার বিয়ের শাড়ি
দাদু ভাইয়ের ট্যাঁকঘড়ি।
হয়তো আছে সোনা-রুপো
কিম্বা কাপড় ছেঁড়া খোড়া
কিম্বা দাদুর ফেলে দেয়া
সুতোয় বাঁধা চশমা জোড়া।
ফিস ফিসিয়ে কানে কানে
বলে পাড়ার নিন্দুকে
কিস্‌সা নেই দিদিমার ঐ
রহস্যময় সিন্দুকে।
দিদা বলেন, বাক্স নিয়ে
যার যা খুশি বলুক না
থাকবো বেঁচে যেকটা দিন
কানা ঘুষো চলুক না।

রূপ কথার দেশে

প্রসাদ দাস মুখোপাধ্যায়

দাদু বলেন, পক্ষিরাজে চড়ে,
ঘুরে এলেম ধু ধু তেপান্তরে।
ব্যাঙ্গমা আর ব্যাঙ্গমীদের সাথে,
দেখা হল সাগর পারের গাঁতে।
হাঁউ মাঁউ খাঁউ রাক্ষসেরা এসে
একটুখানি দাঁড়াল কাছ ঘেঁসে।
দেখতে পেলেম মাকড়সা জাল বেয়ে,
মর্তে নামে পরীর দেশের মেয়ে।
শাঁক চুন্নী এঁদো পুকুর পাড়ে।
আমায় দেখে তাকায় আড়ে আড়ে।
পশু পাখি কইল কত কথা,
বন, পাহাড়ের শোনাল রূপকথা।
বলল আমায়, একলা কেন এলে,
ছোট্ট সোনা বন্ধুদেরে ফেলে ?
ওরা এলেই আসর শুরু হবে,
'চলুন দাদু' বলল ছোট সবে।
জ্ঞানী কাকু হঠাৎ দিলেন তাড়া,
আজগুবি সব, দেখাই মজা দাঁড়া !
দাদুরে ঠিক পাঠিয়ে দেব রাঁচি,
ছোট্টরা কয়, 'মোরাও সাথে আছি।'
জ্ঞানী কাকু চুলকে বলেন মাথা,
'কি আর করি, চলুক তবে যা তা।'

কারু ও লক্ষ্মী

শৈবাল চক্রবর্তী

কারু বলে গাঁয়ের যে ছেলেটা জন্তু জানোয়ার পোষার জন্যে পাগল তার একজন বন্ধু আছে। এ বন্ধু কারুর চেয়ে বয়সে অনেক বড়। কিন্তু দুজনের মধ্যে এত ভাব যে দেখে

মনে হয় না তাদের মধ্যে বয়সের এত তফাৎ। কারুর এই বন্ধুর নাম শ্রীকান্ত মাঝি। শ্রীকান্তর মাথায় ঝাঁকড়া কালো চুল, গায়ের রং মিশমিশে কালো। তার বয়স হবে তিরিশের কোঠায় আর কারু তো এই সবে এগারোয় পা দিল। শ্রীকান্ত কারুর মত বয়স থেকেই জঙ্গলে ঘোরে। জঙ্গলের পাশে তিরিং নদী, সেই নদীর ধারেই তার ঘর। নদীর ধারের জমিতে সে শসা ফলায়, তরমুজের চাষ করে। গাঁয়ের হাটে নিয়ে এসে বিক্রি করে সেই সব ফল পাকুড়। এ ছাড়া সে জানে হাতের কাজ। কারুর যে পাখি ধরার খাঁচাটা রয়েছে সেটা শ্রীকান্তই বানিয়ে দিয়েছে তাকে। প্রথম প্রথম সেটা পেয়ে কি খুশিই হয়েছিল কারু। এখন খাঁচাটা দেখলেই ভারি মন খারাপ হয়ে যায় তার। এতদিনে ও তাতে রাখার জন্যে একটা পাখি কি খরগোশ জুটল না এই নিয়ে ভারি দুঃখ তার মনে।

কাজের ফাঁকে ছুটি পেলে শ্রীকান্ত চলে যায় জঙ্গলে। জঙ্গলের নাম মেঘাসোনি। যেখানে শাল, সুন্দরী আর সেগুন গাছের মেলা। শ্রীকান্ত জঙ্গলের ধারে ফাঁদ পেতে পাখি ধরে, ধরে খরগোশ। হরিণ ধরা বড় কঠিন, ওরা ভারি সাবধানী। একটু শব্দ পেলে নিমেষে উধাও। শ্রীকান্ত অনেক চেষ্টা করেছে, তবু এতদিনে একটা হরিণও ধরতে পারে নি। পাখি কি খরগোশ যখন যা পায় শ্রীকান্ত গাঁয়ের বাবুদের কাছে বিক্রি করে দিয়ে যায়। শ্রীকান্ত বড় গরীব। তার ঘরের পাশে এক টুকরো জমি। বৃষ্টি না হলে সে জমিতে ফসল ফলে না আবার নদীতে বান ডাকলে শসা কি ধানগাছ যায় ভেসে। যত দুঃখ থাক শ্রীকান্তর মুখে হাসি লেগে থাকে সবসময়। তাই তাকে সবাই এত ভালবাসে।

কারুর সঙ্গে ভারি ভাব শ্রীকান্তর। কারু তার কাছে বন জঙ্গলের গল্প শোনে। খুব ভাল ভালুক নাচ নাচতে পারে শ্রীকান্ত। মঙ্গলবারের হাটে একবার তার হুতুমথুমো নাচ দেখে ভারি মজা পেয়েছিল কারু। সেই থেকে দুজনের বন্ধুত্ব। শ্রীকান্তর ভাল লেগেছিল কারুর জন্তু পোষার সখ শুনে। এখন তো অনেকেই জন্তু জানোয়ার মারতে চায়; দু চারজন আছে যারা ওদের ভালবাসে, পুষতে চায়।

শ্রীকান্ত জানে কারু পশু কি পাখি কত ভালবাসে! সে-ও খুব চায় কারুকে একটা কিছু এনে দিতে। আসলে শ্রীকান্ত যখনই কারুদের গাঁ জয়চণ্ডীপুরে খরগোশ কি কাকাতুয়া কিছু নিয়ে আসে তা দিতে হয় রায়বাবুকে। রায়বাবু এ গাঁয়ের ধনীমানী লোক। বছর দুই আগে খুব খরা হয়েছিল শ্রীকান্তদের গ্রামে। চাষবাস সব বন্ধ ছিল। সেই অভাবের দিনে রায়বাবুর কাছে মোটা টাকা ধার করে দিন চলেছিল শ্রীকান্তর। নগদ টাকায় সে ধার শোধ করবে এমন ক্ষমতা শ্রীকান্তর নেই। তাই সে পশু পাখি এনে দেয় এই সৌখীন মানুষটির হাতে। তিনি এক একটি জিনিসের দাম ধরে তাঁর পাওনা থেকে বাদ দেন। এই দুবছরের মধ্যে মোট দেনার অনেকটাই শোধ করে দিয়েছে এখন বাকি আছে অল্পই। শ্রীকান্ত কারুকে বুঝিয়েছে তার ধার শোধ হওয়ার পর সে যা পাবে চন্দনা পাখি, রাজহাঁস বা জংলা হরিণ যা-ই হোক না এনে দেবে কারুকে। কারু ভাবে সেদিন কবে আসবে!

শ্রীকান্ত দিয়েছিল খাঁচা আর বাজারের ভোলা মিস্ত্রি কাঠের বাক্স একটা। ভোলার ছেলে হেবো কারুর সঙ্গে পড়ে। হেবোরা খুব গরীব। বই খাতা কিনতে পারে না। কারু তাকে হাসি-খুশি বই দিয়েছিল একটা। পরদিন ভোলা মিস্ত্রি তাদের বাড়ি এসে হাজির। হাতে সুন্দর একটা কাঠের বাক্স। বলে, 'এটা কারুবাবুকে দিলাম।' ওতে কি রাখবে কারু? রাখতে ইচ্ছে তো করে অনেক কিছু। কিন্তু কে তাকে এনে দিচ্ছে পোষ মানানোর জন্য একট পশু কি পাখি!

কারু সে রাতে জগদ্ধাত্রী ঠাকুরের স্বপ্ন

দেখেছিল। মাথার কাছে রেখেছিল কাঠের বাক্স। ঠাকুর তার শিয়রের কাছে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'তুই কি বর চাস? তুই বড় ভাল ছেলে।' কারু দিদার কাছে শুনেছিল ঠাকুর দেবতারা খুশি হলে মানুষদের বর দেন। কারু স্বপ্নের মধ্যে বলেছিল, 'আমি কি চাই তা তুমি জানো ঠাকুর।' তারপর জগদ্ধাত্রী মিলিয়ে যান হাওয়ায়। কারু জানলা দিয়ে বাগানের দিকে তাকায়। কোথাও কেউ নেই। বাগানের গাছ-গুলো শুধু বাতাস আর জ্যোৎস্নায় মাখামাখি হয়ে দাঁড়িয়ে।

সকালে ছাদে উঠে সে বাক্সটা রং করতে বসেছিল। আজ রবিবার, পাঠশালা ছুটি। সে সকাল থেকে অনেকক্ষণ পড়েছে। তুষ্টুদের বাড়ি জানালা দরজা রং হচ্ছিল, কারু তাই একটু চেয়ে এনেছে তুষ্টুর কাছ থেকে। পাটকাটি দিয়ে সেই রং বুলোচ্ছে সে বাক্সর গায়ে এমন সময় মনে হল কে যেন ডাকল তাকে রাস্তা থেকে।

কে ডাকে? মামা কাছারী গেছে কি জরুরী কাজে। ছেলের দল রথতলায় ঠাকুর গড়া দেখছে। তবে কে ডাকে? দিদা রান্নাঘর থেকে গলা বাড়িয়ে বলছে 'ও কেরো তোকে কে ডাকে দেখ।'

এ যে, শ্রীকান্ত মাঝির গলা! 'বাবুমশাই, ও বাবুমশাই।'

কারু তরতরিয়ে সিঁড়ি বেয়ে এক লাফে সদর দরজায়। যা ভেবেছে—শ্রীকান্ত। কিন্তু ওর কোলে ওটা কি? কারু কি স্বপ্ন দেখছে? কি মিষ্টি দেখতে হরিণছানাটা! কারুর চোখের পলক পড়ে না।

'এমন করে কি দেখছো গো বাবুমশাই?' শ্রীকান্ত মিটি মিটি হাসছে, 'মুখে কথা নেই কেন?'

'এ কার গো?' বেশ কিছুক্ষণ পরে কারু কেবল এইটুকুই বলতে পারে!

'বলেছিলুম না এবার যা পাবো তা তোমার,' শাদা দাঁত মেলে হাসে শ্রীকান্ত মাঝি, 'তোমাকে দেব বলেই তো এনেছি।'

সঙ্গে সঙ্গে হৈ চৈ পড়ে যায়। কারু চেঁচিয়ে বলে, 'ও দিদা, দেখ মাঝি কি এনেছে। দিদা গো-।' শ্রীকান্তর হাত ধরে টানে সে, বলে, 'চলো, চলো মাঝি, ভেতরে চলো।'

আঁচলে হাত মুছতে মুছতে ব্যস্ত দিদা এগিয়ে আসে, 'এত সোরগোল কিসের এ্যাঁ! বাড়িতে কি ডাকাত পড়েছে?' সামনেই শ্রীকান্ত। দিদা চোখ কপালে তুলে বলে, 'ও মাঝি তোমার কোলে ও হরিণ ছানা মনে হচ্ছে। হ্যাঁ, তাই তো। ও মা গো!'

নিজের বুকে আঙুল ঠুকে কারু বলে, 'আমার! জানো তো আমার। আমার জন্যে··· আমি পুষব বলে আনা। তাই না মাঝি?'

শ্রীকান্ত হাসি হাসি মুখে মাথা নাড়ে।

দিদার ফোকলা দাঁতে হাসির ফোয়ারা। বলে, 'তাই নাকি? এতদিন পরে কারুবাবুর কপাল খুলল।' তারপরেই হাত নেড়ে বলে,

হরিণ ছানা, হরিণ ছানা,
হেথায় কেন বনে যানা।
হরিণ বললে, বনের বাসা
ভাল লাগেনা তাই তো আসা।

ভক্তের ডাকে ভগবান সাড়া দেন এ যে তাই হল রে ছোঁড়া। কোথা দাঁড়কাক আর মুরগির ছা পোষার স্বপ্ন দেখছিলি পেয়ে গেলি কি না সোনার হরিণ।'

পিল পিল করে বাড়ির ভেতর ঢুকে পড়ে একপাল ছেলে। তুষ্টু, হেবো, কিত্তিবাস আরও কে কে যেন।

'ও মা, কারু তবে তো ঠিক শুনেছি,' কল্ কল করে ওঠে ওরা একসঙ্গে, 'তবে তো ঠিক শুনেছি।'

কিত্তিবাস বলে, 'আমার তো শুনে প্রথমে বিশ্বাসই হতে চায় নি' তুষ্টু বলে, 'জানিস

রথতলা থেকে ছুটতে ছুটতে আসছি, একটুও দাঁড়াই নি।'

'ভাল করে আটকে রাখিস,' হেবোর মুখটা বেশ গম্ভীর, 'যা জোরে ছোটে না এরা, একটু ছাড়া পেলেই বাস বনে উধাও।'

ওদের মুখে কথার কামাই নেই। দিদা যেন ওদের মুখ বন্ধ করার জন্যে হাতে তুলে দেন খইয়ের আর মুড়ির মোয়া। ওরা খেতে খেতেও কথা বলে অনর্গল।

ছেলের দল চলে যেতেই কারু ঘন হয়ে বসে শ্রীকান্তর কাছে। এতক্ষণ সে ছটফট করছিল তার মুখ থেকে সব শুনবে বলে। এখন একা পেয়ে শুধোয় 'ওর নাম কি শ্রীকান্ত?'

পেতলের সরায় করে কাঁচালংকা দিয়ে তেল-মাখা মুড়ি খাচ্ছিল শ্রীকান্ত। হেসে জবাব দেয়, 'নাম তো কিছু নেই। তুমি একটা দিয়ে দিও।'

কারুর মনে হয় জগদ্ধাত্রী তাকে বর দিয়ে দিয়েছেন। খুব ভাল ঠাকুর জগদ্ধাত্রী। কারু ফিক করে হেসে বলে, 'ওর নাম থাকুক লক্ষ্মী। খুব লক্ষ্মী মনে হচ্ছে ওকে। কেমন নাম মাঝি?'

'খুব ভাল নাম,' শ্রীকান্ত কাঁচালংকায় কামড় দিয়ে মাথা নাড়ে, 'খুব সুন্দর।'

কারু বাক্সর ডালাটা খোলে। দেখি এর ভেতর ওর জায়গা হবে কি না। বাক্সয় পোরার আগে হরিণ ছানাটার গায়ে আলতো করে হাত বুলিয়ে জিজ্ঞেস করে, 'ও কি খাবে শ্রীকান্ত?'

'কি আর খাবে? বনে থাকলে খেত কচি ঘাস। তাই দিও বাগান থেকে তুলে। আর পারলে একটু কাঁচা দুধ।'

কারু গলা বাড়িয়ে বলে, 'দিদা একটু দুধ রেখো লক্ষ্মীর জন্যে। আমার দুধটাই রেখে দিও না হয়।'

রান্নাঘরের চৌকাঠে দাঁড়িয়ে দিদা বলেন, 'লক্ষ্মী, এর মধ্যে নামকরণও হয়ে গেছে! তা নাওয়া খাওয়া কিছু হবে, না হরিণ নিয়ে পড়ে থাকলে পেট ভরবে?'

কারু চেঁচিয়ে বলে, 'এখন না' শ্রীকান্তর গা ঘেঁষে বসে বলে, 'কেমন করে ধরলে ওকে মাঝি বলো তো।'

'তখন রাত দুটো হবে,' শ্রীকান্ত বলে যায় 'তিরিং নদীর জলে চাঁদের আলো পড়েছে। এমনি জ্যোৎস্না রাতে হরিণেরা নদীতে জল খেতে আসে। আমি দেখলুম হঠাৎ নদীর পাড়ে কে যেন সোনা ছিটিয়ে দিল। বন থেকে হরিণের পাল এসেছে বালির চরে। ওহ্ সে কি বাহার যদি দেখতে। পশুপাখি ধরার কথা ভুলে যেতে হয়। ইচ্ছে হয় ওদের সঙ্গে হরিণ হয়ে ঘুরি বনে বনে।

...সব কটাই পালিয়েছিল। শুধু বাচ্চাটাই ফাঁদে পড়ল ধরা। তখন নদীর ধার নিঝুম ঝাউগাছের নিচে বাতাস যেন কেঁদে কেঁদে ফিরছে। ফাঁদ থেকে ছাড়িয়ে ওকে কোলে তুলে নিয়েছি। দু পা এগিয়ে পেছন দিয়ে দেখি একটা বড় হরিণ। বোধহয় ওর মা।'

'কি করল ওর মা?' এক মনে শুনতে শুনতে কারু প্রশ্ন করে।

'বনের পথ ধরে যতদূর এলাম আমি, ও এল আমার পিছু পিছু। যখনই একটু থেমে পেছনে তাকাই দেখি ও তাকিয়ে রয়েছে আমার দিকে বড় বড় চোখে। মাঝে মাঝে গোঙানীর মত আওয়াজ করে যেন বলতে চায় কেন আমার বাচ্চাকে ধরে নিয়ে যাচ্ছো তুমি?' একটু থেমে শ্রীকান্ত বলে। 'পশু পাখি ধরি বটে বাবুমশাই কিন্তু বড় মায়া হয় গো।'

'হুঁ', কারু আনমনে বলে। শ্রীকান্তর কথা শুনতে শুনতে সে যেন চলে গিয়েছে তিরিং নদীর ধারে, নিঝুম রাতে যেখানে জল খেতে আসে হরিণের পাল।

'তারপর জঙ্গল পাতলা হয়ে যখন গাঁয়ের পথ সুরু হল তখন আর ও আসে কোন সাহসে! পায়ে পায়ে আবার বনে ফিরে যায় সে, আমি পৌঁছে যাই গাঁয়ে।' কথা শেষ করে মুড়ির সরা নামিয়ে রাখে, শ্রীকান্ত, 'যাই হোক বাবুমশাই তুমি খুশি তো?'

খুশি বলে খুশি! কারুর মুখে আলো ঝলমল্ করে। সে ফের লক্ষ্মীর কাছে যায়। 'লক্ষ্মী, এই লক্ষ্মী, আমি তোকে ভীষণ আদর করব। তোকে পাশে নিয়ে শোব। তুই আমার সঙ্গে বসে খাবি। দুধ, মাছ, আমসত্ত্ব যা চাস। দেখিস, তোর কোন কষ্ট হবে না। তুই যদি পালিয়ে যাস তো দেখিস আমিও পালাব বাড়ি ছেড়ে।'

শ্রীকান্ত চলে যাওয়ার পরেও কারু ঠায় যেখানে বসে থাকে। দিদা এসে বলে, 'এই ছোঁড়া এবার ওঠ। এতো তোরই রইল। যা এখন পুকুরে ডুব দিয়ে ভাত খাবি আয়। আজ ট্যাংরা মাছের ঝাল করেছি।'

বেশ কবার বলতে তবে কারু ওঠে। কোন রকমে দুটি খেয়ে আবার এসে বসে লক্ষ্মীর পাশে। দুধের বাটি ধরে তার সামনে। লক্ষ্মী যেন বাক্সর ভেতর বন্দী হয়ে থাকতে চায় না। সে ছটফট করে। কারু যেন এখনও বিশ্বাস করতে পারে না এ হরিণ ছানাটা তার। এখন থেকে থাকবে তারই কাছে।

'জানো দিদা।' কারু বলে, 'মাঝি কি বলছিল। বলছিল ওর মা নাকি লক্ষ্মীর পেছু পেছু বনের শেষ পর্যন্ত এসেছিল। ওর মা যখন ডাকছিল তখন মাঝির কোল থেকে লক্ষ্মী নাকি সাড়া দিচ্ছিল সে ডাকের।'

দাওয়ায় মাদুর বিছিয়ে হাত পাখা টানতে টানতে দিদা বলে। 'আহা রে।'

দিদার ওই আহা রে, যেন কারুকে উসকে দেয়। সে তিড়িং করে এক লাফ দিয়ে দিদার কাছে এসে প্রশ্ন করে, 'এখন কি করছে দিদা, লক্ষ্মীর মা?'

'কি আর করছে। বাচ্চাটাকে হারিয়ে একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছে বনে,' দিদা একটা হাই তোলে। সে যাই হোক তুই এখন একটু ঘুমিয়ে নে,' বাবা বিবাগী হয়ে যাওয়া, মা-হারা ছেলেটার পিঠে হাত বুলিয়ে দিয়ে দিদা বলে, 'পরশু রাত জেগে যাত্রা দেখেছিস। এখন ঘুমো একটু'

কিন্তু কারুর চোখ থেকে ঘুম যেন ছুটি নিয়েছে। দিদা চোখ বুজতে সে চলে আসে লক্ষ্মীর কাছে। বাক্সের ফোকরে মুখ লাগিয়ে বলে, 'এই লক্ষ্মী, তোর মায়ের কথা মনে পড়ছে? সত্যি করে বল্।' কারু ভাবে আহা লক্ষ্মী যদি কথা বলতে পারত। দিদার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে, রামু কামারের দোকান থেকে হাতুড়ি পেটার আওয়াজ আসছে। একটা দুটো পাখি ডাকছে বাগানে। লক্ষ্মী যদি কথা বলতে পারত কারু তবে তার সঙ্গে গল্প করে কাটিয়ে দিত সারা দুপুর।

সন্ধের মুখে মামা বাড়ি ফিরতে আবার আর এক দফা হৈ হৈ। আজ মামা কাছারী ফেরৎ হাবু ময়রার দোকান হয়ে এসেছে। হাতের চ্যাঙাড়ীতে বোঁদে, জিবেগজা। চৌকাঠ পেরিয়েই হাঁক ছাড়ে 'কেরো।'

মামার এক মুখ দাড়ি মাথায় বাবরি চুল বগলে ছাতা। মামা রায়বাবুর কাছারীতে খাতা লেখে আর লেখে যাত্রার পালা—মেঘনাদবধ। মামার গায়ের রং মিশকালো কিন্তু মনটি রসে টইটুম্বুর।

কারু ছুটে এসে বলে, 'শুনেছ?' চোখ পাকিয়ে মামা বলে, 'শুনি নি আবার। গোটা জয়চণ্ডীপুরে আজ কারও জানতে বাকি আছে এ খবর! এখন শুধু চোখে দেখা বাকি।' কারু মামার হাত ধরে টান দিয়ে বলে, 'এসো এসো।'

মামা উবু হয়ে বসে ফোকরে চোখ লাগিয়ে বলে, 'বাঃ এতো বেড়ে দেখতে রে!' খাবারের ঠোঙা কারুর হাতে ধরিয়ে দিয়ে মামা সত্যি সত্যি নেচে নেয় এক পাক। মামার রঙ্গ দেখে হেসে কুটিপাটি দিদা বলে, 'ওরে, থাম থাম।'

গোটা সন্ধেবেলা খাওয়া, গল্প আর হৈ হৈ করে কাটে। নাড়ু, কিত্তিবাসরা আরও একবার দেখে যায় লক্ষ্মীকে। মাঝরাতে কারুর ঘুম ভেঙ্গে যায়। বাঁশ বাগানে হাওয়া বইছে শন্ শন্ করে, চাঁদের আলো যেন মানুষকে স্বপ্নের দেশে নিয়ে যেতে চায়। কারুর চোখে ভাসে

তিরিং নদী। সেই যেমন শ্রীকান্ত বলেছিল কারু যেন দেখতে পায় নদী, বালির চরে পড়েছে এক ফালি জ্যোৎস্না। সোনালি হরিণের দল জল খেতে এসেছে নদীতে।

কারু বিছানা থেকে নামে। পা টিপে টিপে এসে উবু হয়ে বসে বাক্সটার সামনে। ডালাটা খোলে আস্তে। নিশুতি রাত, দিদা, মামা দুজনেই অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কেউ জানতে পারে না, কারু সদর দরজা খুলে নেমে আসে পথে।

কারু হাঁটছে তো হাঁটছেই। তার চোখে মুখে এসে লাগে ঠাণ্ডা হাওয়া। চারিদিক অন্ধকার আর কুয়াশায় ঢাকা। এমন রাত কারু এই প্রথম দেখে। লক্ষ্মী তার দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে। কারু অনেকখানি পথ হেঁটে এসেছে। ওই বোধহয় মেঘাসোনির জঙ্গল। দূর থেকে মেঘের মত দেখায় গাছগুলো। কারু এই জঙ্গলের কত গল্প শুনেছে। আজ প্রথম সে তার ধারে দাঁড়িয়ে।

বনের সীমানায় এসে কোল থেকে লক্ষ্মীকে নিচে নামিয়ে দেয় কারু। ফিস্ ফিস্ করে বলে, 'তোকে ছেড়ে থাকতে আমার কষ্ট হবে রে লক্ষ্মী। কিন্তু তুই তো তোর মাকে ছেড়ে থাকতে পারবি না তাই তোকে ফিরিয়ে দিয়ে গেলুম।'

কারু চলতে আরম্ভ করে। লক্ষ্মী কিন্তু ঠায় সেখানে দাঁড়িয়ে। কারু দুপা হাঁটে আবার ফিরে দেখে। দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ লক্ষ্মী দৌড় দিয়ে তার কাছে আসে। তার পায়ের ওপর মুখ ঘষে। কারু অবাক হয়। হেঁট হয়ে বসে সে লক্ষ্মীর মুখটা তুলে ধরে। লক্ষ্মী যেন কি বলতে চায়। কারুর মুখে ভোরের আলো এসে পড়ে। পুবদিক ফরসা সবে তখন মেঘাসোনীর উঁচু, উঁচু গাছগুলোর চূড়ো স্পর্শ করেছে সূর্যের প্রথম কিরণ।

কারু এখন বাড়ির দিকে ছুটছে। তার চোখভরা জল, মুখে হাসি উপছে পড়ছে।

সকাল থেকে এদিকে দিদা বিছানায় উপুড় হয়ে কাঁদছে। মামা জানলার ধারে দাঁড়িয়ে থমথমে মুখে। সাতসকালে উঠে গাঁয়ের সীমানা পর্যন্ত তিনবার চক্কর মেরে এসেছে দুখী মামা কোথাও কারুকে পায় নি। হেবো, কিত্তিবাস, নাড়ু কারুর সব বন্ধুরা বসে আছে গালে হাত দিয়ে। কোথায় যেতে পারে কোথায় আছে সে? হেবোর ঠাকুমা দিদাকে বললেন, 'এমন করে কাঁদে না, উঠে বোসো। সমস্ত গাঁ জুড়ে খোঁজা হচ্ছে নিশ্চয় পাওয়া যাবে।' চোখ মুছতে মুছতে দিদা বলে, 'তাকে না পাওয়া গেলে আমি বাঁচবো কেমন করে।'

হঠাৎ কে যেন বলে ওঠে, 'ওই তো কারু।' কিত্তিবাসের দিদি পারুল বলে, 'মুখুজ্জে মা, ওই তো তোমার নাতি।'

দিদা ধড়মড়িয়ে উঠে বসে। মামা সদরের দিকে ছুটে যায়।

'কোথা ছিলি লক্ষ্মীছাড়া?' হাসিতে, কান্নায় আকুল দিদা কারুর দুই কান ধরে ঝাঁকুনি দেয়।

কারুর হাঁটু পর্যন্ত ধুলো, মাথার চুল উস্কো খুস্কো। খালি পায়ে হেঁটেছে বলে, পায়ে ঘাসের টুকরো, শিশির।

'চুপ করে আছিস কেন বল্,' মামা ধমকে ওঠে।

'মেঘাসোনী,' দিদার দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় জবাব দেয় কারু, 'লক্ষ্মীকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসতে গেছলুম গো। ও কিন্তু সেখানে থাকতে চাইল না। দিদা, ও আমাকে খুব ভালবাসে। লক্ষ্মী আমাদের কাছে থাকবে দিদা। লক্ষ্মী'...

কারু কথা শেষ করতে পারে না। চোখের জল মুছে দিদা তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে। মামা এক হাতে চড় তুলেছিল এখন দুহাত পেতে কারুর হাত থেকে লক্ষ্মীকে নিজের কোলে নিতে নিতে বলে, 'পাগল। একেবারে পাগল।'

* * *

চাবিকাঠি

অচিন্ত্য দাস

আমার নাম শুভো। এবারে ক্লাস নাইনে উঠেছি। বাড়িতে আমরা চারজন থাকি —আমি, বাবা, মা আর বিশুকাকা। বিশুকাকার ভাল নাম বিশ্বপ্রিয়। বাবার খুড়োতুতো ভাই। আমাদের বাড়িটা পুরোনো হলেও বেশ বড়, প্রত্যেক বছর দুর্গাপুজো হয়। গতবছর দুর্গাপুজোর কয়েকদিন আগেই ব্যাপারটা ঘটেছিল।

আমাদের বাড়িতে একটা বিরাট লোহার সিন্দুক আছে। ওটার মধ্যে পুজোর বাসনগুলো থাকে। পুজোর দিন পনেরো আগে ওগুলো সব বার করে তেঁতুল দিয়ে ঝকঝকে করে মাজা হয়। গতবার সিন্দুক খুলতে গিয়েই দেখা গেল চাবি পাওয়া যাচ্ছে না। চাবিটা সাধারণতঃ থাকে বিশুকাকার কাছে, কিন্তু কদিন হল বিশু-কাকা বেড়াতে গেছে দেওঘরে। কি করা যায়? বিশুকাকাকে তক্ষুণি চিঠি দেওয়া হল—ভাগ্যিস ঠিকানাটা দিয়ে গিয়েছিল!

বিশুকাকার এই এক নেশা আছে। হঠাৎ হঠাৎ বেরিয়ে পড়ে—আর এমন সব জায়গায় যায় যার নামই কেউ কোনদিন শোনেনি। যেমন সেবার পুরী থেকে ঘুরে এসে বলল, সমুদ্রের ধার ধ'রে ধ'রে হেঁটে হেঁটে অনেক দূরে কি একটা গ্রামে চলে গিয়েছিলো। সেখানে নাকি একরকমের লম্বা লম্বা কুমীর দেখে এসেছে।

যাইহোক দিন পাঁচেকের মধ্যে চিঠির উত্তর এসে গেল। কিন্তু তাতে আমাদের সমস্যা আরও বেড়ে গেল। তিন লাইনের চিঠি আর ভাষাটাও কেমন যেন। লেখা রয়েছে;

'চাবি রেখে এসেছি নীলগিরির ওপারে····· সেখানে আস্তানা গেড়েছে কতগুলো মাংসাশী সরীসৃপ···সেখানে সময় থেমে আছে বহুদিন ধ'রে '

ব্যাস্, চিঠি শেষ।

মা তো রেগে আগুন, বলল—'হেঁয়ালী করার আর সময় পেলে না!'

এরই মধ্যে আবার আরেক ঝামেলা—বাবাকে অফিসের কাজে সেদিনই যেতে হবে দিল্লিতে, ছ'দিনের জন্য।

যাবার আগে বাবা বললেন—'বিশুর এক বন্ধু থাকে না এ পাড়ায়, মুকুন্দ না কি নাম যেন, ওকে একবার ডেকে দেখিস ত—ও আবার শুনেছি ওইসব 'রহস্য' তারপর 'গোয়েন্দা' গল্পটল্প লেখে। ও যদি কিছু করতে পারে।'

বাবাতো দিল্লি রওনা হয়ে গেল।

মুকুন্দবাবুর বাড়ি খুঁজে বার করে খবর দিলাম। পরদিন সকালেই তিনি এসে উপস্থিত।

চিঠিটা বার ছয়েক কবিতার মত পড়লেন। মাঝে মাঝে আবার সুর এসে যাচ্ছিল গলাতে। তারপর নোটবই খুলে তিনবার টুকে নিলেন। তিনবার কেন জিগ্যেস করাতে বললেন এই-সব 'মহামূল্যবান' সংকেতের নাকি 'কপি' থাকা ভাল।

—'মহামূল্যবান?'

গলা নামিয়ে আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন—'একটা চাবির জন্য শুধুশুধু নীলগিরি পাহাড় টপকাবে শুভঙ্কর? না-না-ওটাকে গুপ্তধন না করলে জমবেনা।'

'শুভঙ্কর?'

'ও শুভঙ্করকে চেননা বুঝি? ও হ'ল আমার ডিটেক্‌টিভ—গল্পতে। আজকেই শুরু করে দেব।'

এবারে চা এসে গেল।

'বাঃ, একেবারে ঠিক সময়ে ঠিক জিনিস। চা না খেলে মাথাটা মোটে খুলতে চায় না।'

চারটে বিস্কুট সহ এক কাপ চা খেয়ে তিনি কিন্তু সটান উঠে দাঁড়ালেন। তারপর মাকে বললেন যে অসম্ভব ভাল 'প্লট' পাওয়া গেল। অনেক ধন্যবাদ।

মা আর আমি প্রায় একসঙ্গে জিগ্যেস করলাম আর চাবিটা? সেটা পাওয়া যাবে ত?

দরজা দিয়ে বেরোতে বেরোতে মুকুন্দবাবু বললেন—'ওরে বাবা! সত্যি সত্যি খুঁজে দিতে হবে? না ভাই না, ও আমার দ্বারা হবে না। বিশের বড় তুখোড় বুদ্ধি—কতবার যে আমায়

বোকা বানিয়েছে তার ঠিক নেই। আর এ চিঠিটা তো কিছুই বুঝলাম না···চাবি রেখে এসেছি নীলগিরি পাহাড়ের ওপারে ··কি জানি বাবা কি মানে এর। তবে শুভঙ্কর অবিশ্যি গুপ্তধনটা নিশ্চয়ই বার করবে। আসলে কি জানেন লেখা আর কাজে অনেক তফাৎ! অনেক তফাৎ। আসছি ভাই, কিছু মনে কোরনা। গল্পটা অবশ্য খুব শীগ্‌গিরি লিখে ফেলব। চললাম।'

দরজাটা বন্ধ করতে করতে মা বলল—'যত্ত সব!'

দেখলাম মার এখনও রাগ পড়েনি। এবারে কি একটা মনে পড়ে যাওয়াতে মনে হ'ল মার মেজাজটা একটু ঠাণ্ডা হল। বলল—'এই শুভো' পল্টুর হোস্টেলের ফোন নম্বরটা লেখা ছিল না? ওকে একটা ফোন করত, বল্ আমি ডেকেছি, ভীষণ দরকার, আজই সন্ধ্যেবেলা যেন একবার আসে। পারলে ওই পারবে।'

তক্ষুণি টেলিফোন করলাম। পল্টুদাকে না পেলেও ওর এক বন্ধুকে পেলাম। সে বলল পল্টুদাকে খবর দিয়ে দেবে।

পল্টুদা আমাদের কেমন যেন দূর সম্পর্কের কি একটা হয়। বাবাকে বলে কাকা আর মাকে কাকীমা। ওদের বাড়ি পাটনাতে— এখানে হোস্টেলে থাকে। ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়ছে। হাবভাব দেখে মনে হয়, লেখা-পড়ার সংগে কোন সম্পর্কই নেই। কিন্তু পরীক্ষায় নাকি সবসময় ভাল রেজাল্ট করে। এই পল্টু-দাকে গোয়েন্দা নিয়োগ করাতে আমার মনটা খুশিতে একেবারে নেচে উঠল। এবারে নিশ্চয়ই কিছু একটা ঘটবে!

ঠিক সাড়ে সাতটার সময় পল্টুদা এল। চিঠিটা পড়ল। উল্টেপাল্টে, আলোর দিকে তুলে ধরে মিনিট খানেক দেখার পর বলল—শুভো, চল তোর বিশুমামার ঘরে বসব। এখানে বসে কাজ হবে না।

বিশু মামার ঘরটা হল একতলার কোণের দিকে, ঠিক রাস্তার ধারে। আসবাব পত্র বলতে একটা খাট আর দুটো মুখোমুখি রাখা গদি আঁটা সোফাসেটের চেয়ার। দেয়ালে তিন চারটে ধুলো পড়া ছবি, একটা ক্যালেণ্ডার আর একসারি তাকে কিছু বই আর পুরোনো অব্যবহারযোগ্য জিনিস পত্র। জানলাগুলো খুলে আলোটা জ্বালানো হল। আমি আর পল্টুদা সোফা দুটো দখল করলাম। মা গেল পল্টুদার জন্য চা করতে।

আলোটার তেমন জোর নেই, তাই ঘরে বেশ একটা আধো অন্ধকার ভাব। পাখাটা চালানো হয়েছে। সেটাতে কেমন যেন একটা আওয়াজ হচ্ছে। আমার মনে হচ্ছে ওটা যেন আমার দিকে তাকিয়ে বলছে—বোকারাম—বোকারাম—বোকারাম। বাইরের রাস্তা দিয়ে লোক চলাচলের শব্দ পাওয়া যাচ্ছে অল্প অল্প। পল্টুদার হাতে চিঠিটা—একমনে ভাবছে—দৃষ্টি সামনের দিকে—মাঝে মাঝে এদিক ওদিক তাকিয়ে কি যেন খুঁজছে।

হঠাৎ কি যে হল—পল্টুদা চিৎকার করে উঠল সরে যা শুভো সরে যা!

আমি একলাফে সোফা থেকে মেঝেতে ঝাঁপিয়ে শুয়ে পড়লাম। কি জানি বাবা! সত্যিই কি গুপ্তধনের ব্যাপার ট্যাপার আছে নাকি? জানলা দিয়ে কোন শত্রু আবার বিষের তীরটির তাক করে নেই ত?

বাইরের জানলা দিয়ে যদি পিস্তলের গুলিও ঘরে ঢুকত, আমি এতটা অবাক হতাম না, যতটা হলাম পল্টুদার কাণ্ড দেখে।

দু লাফে মেঝেতে শুয়ে থাকা আমাকে টপকে, আমি যে সোফাটায় বসে ছিলাম, তার হাতলের ওপর উঠে পড়ল ধাঁ করে। একটানে দেওয়ালে টাঙানো ছবিটা খুলে নামাতেই কতগুলো টিকটিকি এদিক ওদিক সুরসুর করে পালালো আর ছবিটার পেছন থেকে টপ করে মেঝেতে এসে পড়ল সাত রাজার ধন সিন্দুকের চাবি।

মেঝেতে শুয়ে শুয়েই আমি ততক্ষণে দেখে ফেলেছি, ধুলো পড়া ছবিটা একটা পাহাড়ের দৃশ্য। আর ওটার নীচের দিকের কোণায় ছোট ছোট হরফে ইংরেজীতে লেখা রয়েছে 'নীলগিরি হিলস্'।

পল্টুদা বলল—নে ওঠ্। তোদের প্রবলেম সলভ্ড্। তোদের বিশুকাকা হল একটা 'জিনিয়াস' আর তোরা সবাই একটি একটি…… যাক্‌গে…একটা সাবান নিয়ে আয় ত…এক ব্যাটা সরীসৃপ আমার হাতের ওপর দিয়ে চলে গেছে। এই টিকটিকি জিনিসটাকে আমার বড় ঘেন্না।

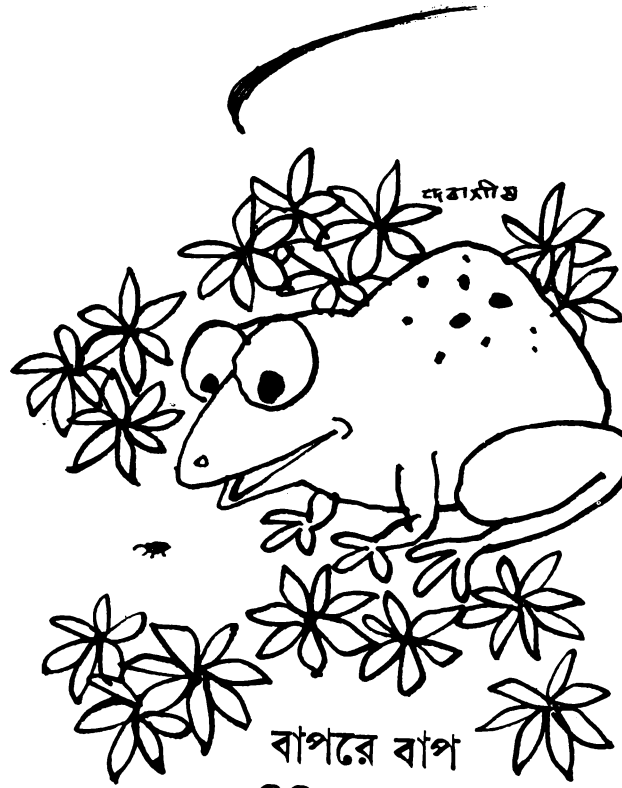

বাপরে বাপ

নিখিল তরফদার

ঝোপের মাঝে ছোট্ট পোকা
মনের সুখে ডাকছিল
একটা বড় সোনা ব্যাঙের
পোকার উপর তাক ছিল।

ক্ষিদের জ্বালায় এক লাফে যেই
পোকাটাকে ধরল ব্যাঙ
মুখের পোকা গিলেই বোকা
সাপের মুখে পড়ল ঠ্যাং।

বাপরে বাপ! রাক্ষুসে সাপ
ব্যাঙটা খেল আস্ত গিলে,
হঠাৎ যমের মত এসে
ছোঁ মেরে নেয় সাপটা চিলে।

পোকা গেল ব্যাঙের পেটে
ব্যাঙটা গিলে খেল সাপ
সাপটা গেল চিলের পেটে
কান্ড কি সব বাপরে বাপ!

নিউস্ক্রিপ্টের ছোটদের অসাধারণ বই

উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী—পৌরাণিক কাহিনী	১০·০০
পুণ্যলতা চক্রবর্তী ছেলেবেলার দিনগুলি	৮·০০
লীলা মজুমদার—উপেন্দ্রকিশোর	৮·০০
মাকু	৭·০০
আজগুবি	১০·০০
সত্যজিৎ রায়—প্রোফেসর শঙ্কু	২০·০০
একেই বলে শুটিং	১২·০০
শিশিরকুমার মজুমদার—দালাং মিশনের ঘণ্টা	৮·০০
নলিনী দাশ—হাতীঘিসার হানাবাড়ি	১২·০০
রানী রূপমতীর রহস্য	১০·০০
মঞ্জিল সেন—গঙ্গোত্রী রহস্য	৬·০০
জ্যোতিরিন্দ্রমোহন জোয়ার্দার অনূদিত	
স্যার আর্থার কোনান ডয়েল—ম্যারাকট ডীপ	১০·০০
রেবন্ত গোস্বামী—বাবলা ফুলের গন্ধে	১০·০০
নিরঞ্জন সিংহ—মহাকাল	১০·০০
প্রণব মুখোপাধ্যায়—নীল শ্যাওলার খোঁজে	৫·০০
বুড়ির ঝুড়ি	৫·০০
ভবানী প্রসাদ মজুমদার—মিঠে কড়া পশুর ছড়া	৫·০০
মিঠে কড়া খেলার ছড়া	১·০০
মিঠে কড়া ভুতের ছড়া	২·০০
নাম তাঁর সুকুমার	৪·০০
শিশির বিশ্বাস—বাঘবন্দী মন্তর	১০·০০
সেরা ভুতের গল্প সংকলন—অশরীরীর আসর	২৫·০০
সম্পাদনা : লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও সত্যজিৎ রায়	
কমিক ষ্ট্রিপ – টোটোর অ্যাডভেঞ্চার	
গল্প—নলিনী দাশ, ছবি : প্রশান্ত	৪·০০
দানোর সন্ধানে	
গল্প : মঞ্জিল সেন, ছবি : সিদ্ধার্থ	৩·০০

নিউস্ক্রিপ্ট —এ ১৪, কলেজ ষ্ট্রিট মার্কেট, কলিকাতা-৭০০ ০০৭

সন্দেশের গ্রাহকেরা এখন নিউস্ক্রিপ্টের বই-এ ২৫%বিশেষ কমিশন পাচ্ছে

Regd.No. WB/SC-102 : SANDESH January Price 4·00

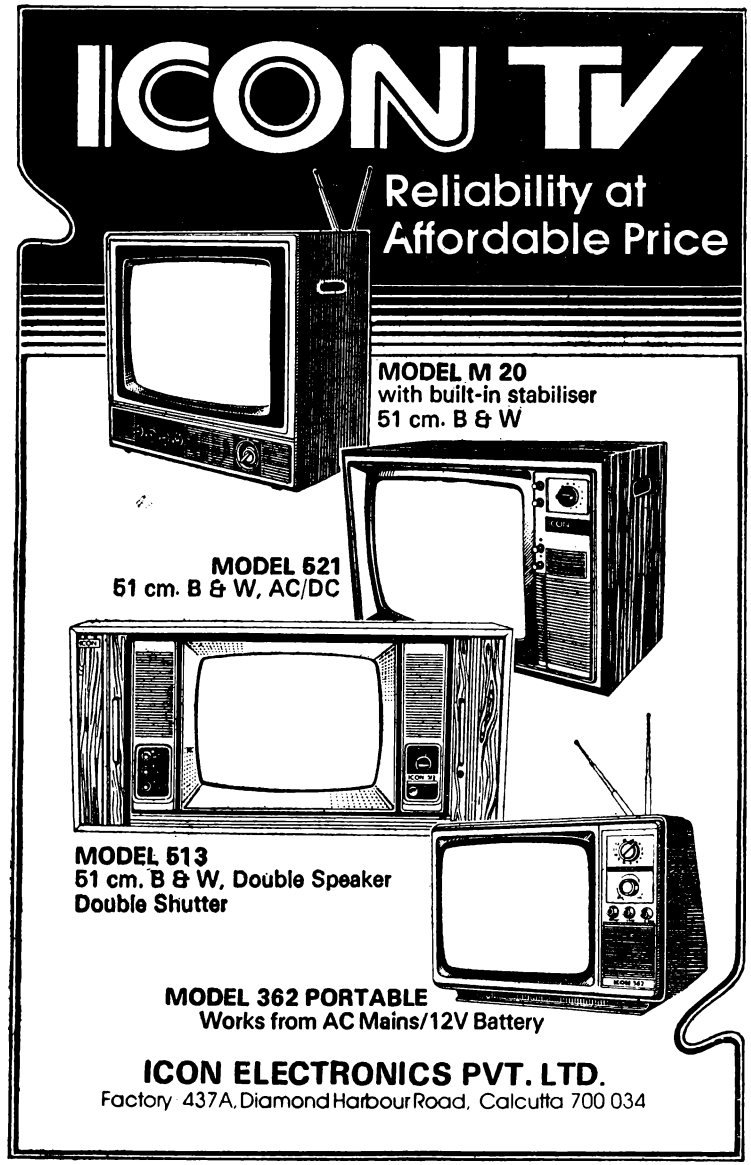

কালিকা প্রিন্টার্স এ্যাণ্ড বাইণ্ডার্স, ১০৯বি, কেশব চন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলি-৯ দ্বারা
সন্দেশ কার্যালয়—১৭২ ৩ রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা-২৯ হইতে
অশোকানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত।